# ইউনিট - ৮

# বিশিষ্ট দার্শনিক ঃ আল-ফারাবী

## Renowned Philosopher : Al-Farabi

আল-কিন্দির পর দ্বিতীয় প্রবীণ এবং কারও মতে সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক আবু নসর আল-ফারাবী মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে দ্বিতীয় শিক্ষক হিসেবে পরিচিত। আল-কিন্দির দার্শনিক ধারা বজায় রেখে তিনি মুসলিম দর্শনকে আরও সুষ্ঠু এবং পূর্ণরূপ দান করেন। আল-কিন্দির দুর্বোধ্য কতকগুলো বিষয়কে তিনি বোধগম্য করে প্রকাশ করার ফলে ইবনে সিনার দর্শন আরও প্রাঞ্জল ও সমন্বয়ধর্মী করে তোলা ইবনে সিনার পক্ষে সম্ভব হয়। আল-ফারাবীর কৃতিত্ব এবং খ্যাতির আরেকটি মূল কারণ হল এ্যারিস্টটলের দর্শনের ব্যাখ্যা। তিনি এ্যারিস্টটলের যুক্তিবিদ্যাকে অতি সূক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং অধিবিদ্যাকে প্রাঞ্জল করে প্রকাশ করেন। প্লেটোর দর্শনকেও তিনি বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে মুসলিম দর্শনকে সমৃদ্ধ করেন। পদার্থবিদ্যা, অধিবিদ্যা, রাষ্ট্র ও সমাজ দর্শনে তাঁর অবদান ও প্রগাঢ় জ্ঞান মুসলিম দর্শনকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করেছে। আমরা এই ইউনিটে তাঁর দর্শন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। এই ইউনিটে মোট চারটি পাঠ রয়েছে।

**পাঠ-১ঃ** **আল-ফারাবীর জীবনী ও গ্রন্থাবলী (Life and Books of Al-Farabi)**

**পাঠ-২ঃ** **আল-ফারাবীর অংকশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা এবং দর্শন (Mathematics, Logic and Philosophy of Al-Farabi)**

**পাঠ-৩ঃ** **আল-ফারাবীর অধিবিদ্যা (Metaphysics of Al-Farabi)**

**পাঠ-৪ঃ** **সামাজিক ও রাষ্ট্রদর্শন সম্পর্কে আল-ফারাবীর ধারণা (Social and Political Philosophy of Al-Farabi)**

# পাঠ-১

## আল-ফারাবীর জীবনী ও গ্রন্থাবলী

## *Life and Books Al-Farabi*

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ শেষে আপনি**

- আল-ফারাবীর জীবনী সম্পর্কে অবগত হবেন।
- আল-ফারাবীর গ্রন্থাবলীর পরিচয় পাবেন।
- তাঁর জীবনী ও গ্রন্থাবলী সম্পর্কে আনুষঙ্গিক কিছু তথ্য পাবেন।

**জীবনী**

আবু নসর আল-ফারাবীর পূর্ণ নাম মোহাম্মদ ইবনে তারখান ইবনে উযলাখ আবু নসর আল-ফারাবী। মধ্যযুগে তিনি আবু নসর নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর ল্যাটিন নাম ছিল আবু নাসের।

দার্শনিক আল-ফারাবীর জীবন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করার পূর্বে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। আল ফারাবীর যুগের প্রথা অনুযায়ী তিনি নিজের জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কে কোন জীবনীগ্রন্থ লিখেননি বলেই জানা যায়। ইবনে সিনার শিষ্য আল-জুরজানী যেমন তাঁর শিক্ষক সিনা সম্পর্কে বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ লিখেন, আল-ফারাবীর কোন শিষ্য সেভাবে কোন গ্রন্থ লিখেননি। ফলে জীবনী লেখকদের নিকট তাঁর জীবনকথা সম্পর্কে তেমন বেশি তথ্য ছিল না। ওফায়াত আল-আয়াস গ্রন্থে তাঁর জীবনী সম্পর্কে যেসব তথ্য দেওয়া হয়েছে সেগুলো সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয় এবং অনেকেই এর যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। সুতরাং আল-ফারাবীর জীবন প্রসঙ্গে যেসব তথ্য অস্পষ্ট এবং যেসব তথ্য এখনও অজানা রয়ে গেছে সেগুলো সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে তাঁর জীবনীগ্রন্থ, দর্শন সংক্রান্ত গ্রন্থ এবং যেসব গ্রন্থ এখনও প্রকাশিত হয়নি সে সম্পর্কে বেশ প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। ১৯৫০ সালে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষে কতিপয় তুর্কি গবেষক পাণ্ডুলিপি আকারে রক্ষিত তাঁর কিছু গ্রন্থ আবিষ্কার করেন এবং আল-ফারাবী সম্পর্কে কিছু অসংগতিমূলক তথ্য চিহ্নিত করেন। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও এখনও বলা যাবে না যে তাঁর সম্পর্কে সব তথ্য পাওয়া গেছে বা জটিলতার অবসান হয়েছে। জানা গেছে বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামিক গ্রন্থাগারে তাঁর লিখিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সীলমোহর করে রেখে দেওয়া হয়েছে। অনেকেরই বিশ্বাস এগুলো প্রকাশিত হলে তাঁর জীবনী ও দর্শন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য জানা সম্ভব। যাহোক, আমরা প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করার চেষ্টা করব।

আল-ফারাবীর জীবনকালকে মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমভাগে তাঁর জন্ম থেকে তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়সকাল অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় বিভাগে অন্তর্ভুক্ত পঞ্চাশ বছর বয়সের পর থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। মোটামুটিভাবে এটা স্বীকৃত যে, তিনি জন্মসূত্রে তার্কিস বা তুর্কি ছিলেন। তাঁর পিতাও একজন তুর্কি ছিলেন এবং তিনি সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে কাজী বা বিচারক হিসেবে কিছুদিন কাজ করেন। তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইসলাম ফারাবে পৌঁছার পর সেখানে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি দ্রুত প্রসার লাভ করে। আল-ফারাবী বাল্যশিক্ষা এ পরিবেশে আরম্ভ করেন। প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ, আল-সিহাহ্'র সংকলক আল-জাওহারী তাঁর সমকালীন ছিলেন। আল-ফারাবী শৈশবে ধর্মীয় ও ভাষাতত্ত্বে ব্যাপক শিক্ষালাভ করেন। তিনি ইসলামী আইন, হাদিস এবং কোরানের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অধ্যয়ন করেন এবং আরবী, তুর্কি ও ফারসি ভাষাতেও পারদর্শিতা লাভ করেন। এছাড়া ইবনে মাল্লিকানের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি 'সত্তর'টি ভাষায় কথা বলতে পারতেন। কারও কারও মতে তিনি গ্রীক ভাষাও আয়ত্ত করেন। কিন্তু কেউ কেউ আবার এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন। সাফসাতাহ্

(সফিস্ট্রি) শব্দটির ব্যাখ্যা তিনি যেভাবে করেন– তা থেকে অনেকেই অনুমান করেন যে, তিনি গ্রীক ভাষা জানতেন না। তাঁর শিক্ষা জীবনকালে তিনি তাঁর অবস্থানস্থলে প্রাপ্ত যৌক্তিক জ্ঞান আহরণে কোনসময় দ্বিধা করেননি। এজন্য তিনি অংকশাস্ত্র ও দর্শন পাঠ শুরু করেন অনেক পূর্ব থেকেই। অন্যান্য দার্শনিক বিশেষত আল-কিন্দির মত তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি তেমন আগ্রহ দেখাননি। তাঁর নিজ শহরে দর্শন সংক্রান্ত শিক্ষালাভ করার পর তিনি যখন দর্শনের প্রতি অধিক আকর্ষিত হয়ে পড়েন, তখন তিনি যা শিখেছিলেন–তাতে আর সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। গভীর জ্ঞান অর্জনের তাগাদায় উদ্দীপ্ত হয়ে তিনি তাঁর নিজ শহর ত্যাগ করেন এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন।

আল-ফারাবী দর্শনচর্চায় সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করার পূর্বে বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করেন। ইবনে খাল্লিকানের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি যথাক্রমে এ্যারিস্টটলের 'ডি এ্যানিমা' গ্রন্থটি দু'শত বার এবং পদার্থ বিষয়ক গ্রন্থটি চল্লিশবার অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়নের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টার আরও অনেক বিবরণ জানা যায়।

আল-ফারাবীর দ্বিতীয় পর্যায়ের জীবন শুরু হয়– তাঁর পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পর থেকে। এ সময় সারা বিশ্বে বাগদাদ নগরী শিক্ষার এক অনন্য কেন্দ্র ছিল। তিনি এজন্য বাগদাদ গমন করেন এবং দীর্ঘদিন যাবৎ বিদ্যা চর্চায় নিয়োজিত থাকেন। তিনি বাগদাদে গমন করার পর সেখানে অনেক দার্শনিক এবং অনুবাদকের সাক্ষাৎ লাভ করেন। এঁদের মধ্যে ইবনে মাত্তা, কুয়াইরী এবং ইয়্যুহান্না বিন হাইলাস অত্যন্ত খ্যাতিমান যুক্তিবিদ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এঁদের অবস্থানের কারণেই খুব সম্ভবত বাগদাদ এসময় যুক্তিবিদ্যার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। যাহোক, ইবনে আবী ওসায়বিয়াহ্‌র মতে, আল-ফারাবী ইয়্যুহান্না বিন হাইলাসের কাছে যুক্তিবিদ্যা অধ্যয়ন শুরু করেন এবং কিছুদিন তাঁর নিকট থেকে যুক্তিবিদ্যা শিক্ষালাভ করেন। এক সময় তিনি তাঁর শিক্ষক ইয়্যুহান্নাকে যুক্তিবিদ্যার জ্ঞানের দিক দিয়ে ছাড়িয়ে যান। সে সময়ের সবচেয়ে প্রখ্যাত যুক্তিবিদ্যাবিশারদ ইবনে ইউনুসকেও তিনি ছাড়িয়ে যান। এ সময়ে এ্যারিস্টটলের যুক্তিবিদ্যায় পুরোপুরি দক্ষতা ও জ্ঞানলাভ করায় তিনি "দ্বিতীয় শিক্ষক" বা মুয়াল্লিমুস সাথী হিসেবে পরিচিত ও খ্যাত হন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বিখ্যাত যুক্তিবিদ ইয়াইয়া ইবনে আদী অন্যতম।

আল-ফারাবী বাগদাদে বিশ বৎসর অতিবাহিত করেন। খুব সম্ভবত রাজনৈতিক গোলযোগের কারণেই তিনি বাগদাদ ত্যাগ করেন। জানা যায়, বাগদাদে অবস্থানকালে তিনি অঙ্কশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করেন। তিনি মিউজিকের ওপরও দু'একটি পুস্তক রচনা করেন। বাগদাদ থেকে তিনি আলেপ্পো গমন করেন। এই সময় আলেপ্পো জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল। আল-ফারাবী হামাদাসী রাজকুমার সাইফ-আদ-দৌলার সঙ্গে পরিচিত হন। জানা যায়, রাজকুমার দৌলা আল-ফারাবীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। বিদ্যানুরাগী এই রাজকুমারের দরবারে এ সময় বহু কবি, ভাষাতত্ত্ববিদ, দার্শনিক এবং আরও অনেক পন্ডিত সমবেত হন। আরবদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও, কোন প্রকার জাতীয় বৈষম্য বা কুসংস্কার এ দরবারের বৈদগ্ধ সাংস্কৃতিক পরিবেশকে দূষিত করতে পারেনি। এখানে আরব, তুর্কি এবং পার্সিয়ান পন্ডিতগণ একত্রে বসে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতেন। কোন কোন বিষয়ে তাঁরা একমত হতেন আবার কোন কোন বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করতেন। এই দরবারে আল-ফারাবী একজন স্কলার এবং সত্য-অনুসন্ধানী হিসেবে অবস্থান করতেন। রাজদরবারের জাকজমকপূর্ণ জীবন ও খ্যাতি তাঁর চরিত্রের ওপর কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। তিনি বরং এখানে একজন সুফীর জীবন যাপন করতেন। জানা যায়, সরকারী কোষাগার থেকে তাঁকে যে ভাতা দেওয়া হতো তা থেকে তিনি প্রতিদিনের জন্য মাত্র চার দিরহাম গ্রহণ করতেন। তিনি প্রখ্যাত চিন্তাবিদ এবং শিক্ষক হিসেবে তাঁর কর্মে বিমুগ্ধ থাকতেন। এ সময় তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন।

আল-ফারাবী জীবনের এ পর্যায়ে কিছু ছোটখাট ভ্রমণ ছাড়া তেমন ব্যাপকভাবে আর কোথাও ভ্রমণ করেননি। ইবনে আবি উসাইবিয়াহ্‌র মতে, আল-ফারাবী মিশর সফর করেন তাঁর জীবনের শেষদিকে।

এ সময় মিশর এবং সিরিয়ার মধ্যে অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল। আল-ফারাবী এরপর ৩৩১/৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ৮১ বৎসর বয়সে দামেস্কে ইন্তেকাল করেন। আমির সাইফ-উদ-দৌলার দরবারে তিনি এমন সম্মানিত ও খ্যাতিমান ব্যক্তি ছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর স্বয়ং আমির সাইফ তাঁর লোকজনসহ আল-ফারাবীর দাফন-কাফন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে উমাইয়া কবরগাহে খলিফা মাবিয়ার পার্শ্বে সমাহিত করা হয়।

**আল-ফারাবীর গ্রন্থাবলী**

আল-কিফতী এবং ইবনে আবী উসাইবিয়ার মতে আল-ফারাবী সত্তরখানা গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর সমকালীন দার্শনিক আল-কিন্দি এবং আল-রাজীর তুলনায় তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা কম মনে হয়। তবে একথা মনে রাখা ভাল যে, জীবনী লেখকদের মতে তাঁর একই গ্রন্থের শিরোনাম দু'বার বা তারও অধিকবার দেওয়া হয়েছে। অন্য ভাষ্য অনুযায়ী তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা একশতের অধিক।

আল-ফারাবীর গ্রন্থাবলীকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম ভাগে কেবল যুক্তিবিদ্যার আলোচনা অন্তর্ভুক্ত এবং দ্বিতীয় বিভাগে অন্য সব বিষয়ের ওপর লিখিত গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত। যুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থগুলি এ্যারিস্টটলের অর্গানন গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কীয়। এসব গ্রন্থ এখনও পাণ্ডুলিপি আকারে রক্ষিত আছে। দ্বিতীয় বিভাগের গ্রন্থগুলো অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লিখিত। এসব বিষয়ের মধ্যে আছে দর্শনের বিভিন্ন শাখা, পদার্থবিদ্যা, অংকশাস্ত্র, অধিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা এবং রাজনৈতিক দর্শন। দ্বিতীয় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে অনেক গ্রন্থ পাওয়া যায়। এর ফলে আল-ফারাবীর দর্শনের বিভিন্ন দিকের স্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব।

ইবনে খাল্লিকানের মতে আল-ফারাবীর প্রায় সমস্ত গ্রন্থ বাগদাদ এবং দামেস্কে লিখা হয়। কারণ তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়সের পূর্বে তিনি কোনও গ্রন্থ লিখেছেন বলে জানা যায় না। জীবনী লেখকরা এ ব্যাপারে একমত। কোন কোন পণ্ডিতব্যক্তি তাঁর গ্রন্থের ক্রমানুযায়ী তালিকা তৈরি করার চেষ্টা করেন। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল– তিনি তাঁর জীবনের শেষ ত্রিশ বছরে তাঁর সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেন এবং যখন তিনি গ্রন্থ রচনা শুরু করেন তখন তিনি পুরোপুরি পরিপক্ক একজন চিন্তাবিদ। এ কারণে তাঁর চিন্তার মধ্যে পুনরাবৃত্তি বা তেমন কোন পরিবর্তন লক্ষযোগ্য নয়।

আল-ফারাবীর লেখার ধরন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁর গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত এবং পরিচ্ছন্ন। তিনি তাঁর লেখায় প্রতিটি শব্দ সজ্ঞানে বেছে নিয়ে তাঁর ধারণা এবং চিন্তাকে প্রকাশ করেন। এজন্য তাঁর লেখা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি এবং আড়ম্বরপূর্ণ শব্দাবলী পরিহার করেন। তাঁর লেখার পদ্ধতিও তাঁর স্টাইলের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। তিনি তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলোকে সর্বজনীন রূপ দেন। তিনি তথ্য সাজান, সমন্বয় সাধন করেন এবং বিশ্লেষণ করেন। তাঁর গ্রন্থে বিভাগ, উপ-বিভাগ এবং শ্রেণীকরণ– তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে। তাঁর কোন কোন গ্রন্থে বিভাগ এবং শ্রেণীকরণ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। তিনি প্রধানত এ্যারিস্টটলের গ্রন্থের উদ্দেশ্য এবং স্টাইলের বিষয়ে বিশেষভাবে নিয়োজিত ছিলেন। মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানের শ্রেণীকরণ করেন আল-ফারাবী। আল-ফারাবীর লেখার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল পদের বিপরীত পদ খুঁজে বের করা। যেমন নঞর্থক-এর বিপরীত সদর্থক এবং সত্তার বিপরীত অ-সত্তা ইত্যাদি।

আল-ফারাবীর গ্রন্থাবলী দশম এবং একাদশ শতাব্দীতে প্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাক্রমে এগুলো পাশ্চাত্যেও পৌঁছে যায়। ফলে তাঁর আন্দলুসীয় কিছু শিষ্য ও ভক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর কিছু গ্রন্থ হিব্রু এবং ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয় এবং খ্রিষ্টান ও ইহুদী স্কলাশটিসিজদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এ গ্রন্থগুলো ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রকাশিত হয়। এসব গ্রন্থের মধ্যে বেশ কিছু গ্রন্থ ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয় এবং তাঁর জ্ঞানের পরিচয় সেসব দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

আল-ফারাবী এ্যারিস্টটলের দর্শনচর্চায় অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তাঁর আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়– এ্যারিস্টটলের গ্রন্থাবলীর ওপর তাঁর ভাষ্য রচনায়। তাঁর টীকা-ভাষ্যগুলো উচ্চস্তরের বৈদগ্ধময় ভাষ্য।

কোনরকম যতিবিরতি ছাড়াই এ ভাষ্যগুলো পরবর্তীকালের গ্রীক দার্শনিক মতবাদসমূহের ধারা বজায় রাখে। এসব টীকা-ভাষ্যগুলোর একটি সংকলন সাম্প্রতিককালে মূল্যবান ও বিশাল কলেবরে নির্ঘণ্টসহ সম্পাদিত হয়েছে। এ্যারিস্টটলের অর্গানন, ফিজিক্স এবং নিকোম্যাকিয়ামন এথিক্স-এর ওপর তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ টীকাভাষ্য আছে। ওপরোক্ত গ্রন্থ ছাড়াও আল-ফারাবীর বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল। যুক্তিবিদ্যার ওপর তাঁর গ্রন্থগুলো হল:

(১) আত-তাওতি 'আ ফিল-মানতিক
(২) কমেন্টারী অন অ্যানালাইটিকা পোস্টেরিয়া
(৩) কমেন্টারী অন-অ্যানালাইটিকা প্রিওয়া
(৪) কমেন্টারী অন দি ইসাগোগ
(৫) কমেন্টারী অন টপিকা (BK II এবং VIII)
(৬) কমেন্টারী অন সফিস্টিকা
(৭) কমেন্টারী অন দি ইন্টারপ্রেটেশান
(৮) কমেন্টারী অন দি ক্যাটেগরিয় এবং
(৯) আশ্‌শের।

এ গ্রন্থগুলো ছাড়াও যুক্তিবিদ্যার ওপর তাঁর আরও ভাষ্য আছে বলে জানা যায়।

পদার্থবিদ্যার ওপর লিখিত গ্রন্থের মধ্যে যেসব গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলো হল– অন ভাক্যুয়াম এবং ফিল আকল বা ডি ইনটেলেক্ট। এগুলো তুর্কী, ল্যাটিন এবং জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

অধিবিদ্যার ওপর তাঁর প্রধান গ্রন্থ হল– ফিল ওয়াহিদ ওয়াল ওয়াহাদ বা অন দি ওয়ান এবং অ্যাবাউট দি ইস্কপ অব এ্যারিস্টটল মেটাফিজিক্স। জার্মান এবং ইংরেজী ভাষায় এগুলো অনূদিত হয়েছে।

নীতিশাস্ত্রের ওপর তাঁর প্রধান গ্রন্থ হল– আত তানবীহ আলা সাবিলিস সা'আদা বা রিমাইনডার অব দি ওয়ে অব হ্যাপিনেস। এটি মধ্যযুগে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ফুসলুল মাদানী বা অ্যাফোরিজমস অব দি স্টেটসম্যান আরেকটি গ্রন্থ। এটি ল্যাটিন ভাষায় টীকাসহ অনূদিত হয়েছে। ফিল মিল্লা আল ফাদিলা বা অন দি বেস্ট রিলিজিওয়ন তাঁর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

রাষ্ট্রদর্শনের ওপর তাঁর গ্রন্থের সংখ্যাও কম নয়। তাঁর লিখিত যেসব গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলো হল– (১) আল-মদিনাতুল ফাযিলাহ (আদর্শ রাষ্ট্র), (২) সিয়াসাতুল মাদানিয়া (নগর রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা), (৩) আরাউয়াল আহ্‌লিল, (৪) জাওয়ামিনুস সিয়াসত, (৫) ইজতিমাউ মাদানিয়াত। রাষ্ট্রদর্শনের ওপর উপরোক্ত গ্রন্থগুলো ছাড়াও প্লেটোর রিপাবলিক এবং এ্যারিস্টটলের দি পলিটিকস গ্রন্থের অনুবাদ ও ভাষ্য তিনি রচনা করেন।

আল-ফারাবী বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তাঁর চিন্তাধারা প্রকাশ করে গ্রন্থ রচনা করেন। অন্যান্য বিষয়ের ওপর যেসব গ্রন্থ রচনা করেন সেগুলো হল–

(১) আল-জাম বায়ানার রায়ায়ি আল-হাকিম আফলাতুন আল-ইলাহি ওয়া আরিসতুতালিস– জার্মান ভাষায় অনূদিত।
(২) উয়্যুনুল মাসাইল (প্রধান প্রশ্নসমূহ)।
(৩) ফুসুস আল-হিকাম।
(৪) জওয়াব মাসাই সুইলা আসহা (প্রশ্নের উত্তর)– জার্মান ভাষায় অনূদিত।
(৫) কিতাব ইহসাইল উলুম (বিজ্ঞান সমূহের জরিপ)–ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত।
(৬) ফি তাহসিলিস সা'আদা–ইংরেজী ভাষায় অনূদিত।
(৭) অন দি ফিলোসফি অব প্লেটো (প্লেটোর দর্শনের ওপর)।
(৮) অন দি ফিলসফি অব এ্যারিস্টটল (এ্যারিস্টটলের দর্শনের ওপর)।

(৯) ফি মাসাদি আরা আহ্‌লিল মাদিনা আল-ফাসিলা–ইংরেজি ভাষায় অনূদিত।
(১০) ইন্ট্রোডাকশন টু লজিক (যুক্তিবিদ্যার ভূমিকা)।
(১১) অ্যাসাইনমেন্ট অব লজিক।

উপরোল্লিখিত গ্রন্থ ছাড়াও আল-ফারাবীর আরও অনেক গ্রন্থের পরিচয় ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে পাওয়া যায়। এসব গ্রন্থে আল-ফারাবীর গবেষণা ও সমীক্ষার ফলাফল ও তাঁর সুদূরপ্রসারী মনোভাবের সারাংশ ও সারমর্ম নিহিত আছে। এই গ্রন্থগুলো রচনার মাধ্যমে তাঁর লক্ষ্য ছিল চিন্তাজগতে ও নিখুঁত সমাজ গঠনে দর্শনকে সার্বভৌম অবস্থান দান করা। এসবের সঠিক উপলব্ধিই আল-ফারাবীর চিন্তাধারাকে সম্যক উপলব্ধি হল করার মূল চাবিকাঠি।

**অনুশীলনী**

১। আল-ফারাবীর জীবনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন এবং চিন্তা করুন তিনি কোন ধরনের সাধক ছিলেন?

২। আল-ফারাবীর জীবনী আলোচনা করুন এবং তাঁর গ্রন্থাবলীর একটি বিবরণ দিন। তাঁর গ্রন্থাবলী সম্পর্কে আপনার মন্তব্য থাকলে লিখুন।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

**সত্য/মিথ্যা**

১। আল-ফারাবী একজন পার্সিয়ান ছিলেন। সত্য/মিথ্যা
২। আল-ফারাবীর বয়স ছিল– একানব্বই বৎসর। সত্য/মিথ্যা
৩। আল-ফারাবীকে তৃতীয় শিক্ষক বলা হয়। সত্য/মিথ্যা
৪। আল-ফারাবী এ্যারিস্টটলের গ্রন্থের প্রধান ভাষ্যকার। সত্য/মিথ্যা
৫। রাষ্ট্রদর্শনের ওপর আল-ফারাবীর কোন গ্রন্থ ছিল না। সত্য/মিথ্যা।

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

১। আল-ফারাবীর জীবনকে ভাগ করা যায়
(ক) পাঁচ ভাগে (খ) দু'ভাগে
(গ) তিন ভাগে। (ঘ) ওপরের কোনটিই নয়।

২। আল-ফারাবীর পিতা ছিলেন একজন
(ক) ব্যবসায়ী (খ) লেখক
(গ) সেনাধ্যক্ষ (ঘ) নাবিক

৩। রাষ্ট্রচিন্তায় আল-ফারাবী ছিলেন
(ক) প্লেটোর ভাবশিষ্য (খ) এ্যারিস্টটলের ভাবশিষ্য
(গ) আলেকজান্ডারের ভাবশিষ্য (ঘ) পোরফাইরির ভাবশিষ্য।

৪। আল-ফারাবীকে বলা হয়
(ক) সুফীসাধক (খ) ব্যবসায়ী
(গ) দ্বিতীয় শিক্ষক (ঘ) ভবঘুরে।

৫। আল-ফারাবী গ্রন্থ রচনা শুরু করেন
(ক) ত্রিশ বছর বয়সে (খ) পঞ্চাশ বছর বয়সে
(গ) ষাট বছর বয়সে (ঘ) আলেন্নোয় গমনের পর।

**রচনামূলক প্রশ্ন**

১। আল-ফারাবীর জীবনের প্রথম ভাগের বিবরণ দিন।

২। আল-ফারাবী কোন সময়ে গ্রন্থ রচনা শুরু করেন? গ্রন্থ রচনা শুরু করার পর থেকে তাঁর জীবনী আলোচনা করুন।

৩। আল-ফারাবীর গ্রন্থাবলীর পরিচয় ও সংক্ষিপ্ত তালিকা দিন।

**উত্তরমালা**

**সত্য/মিথ্যা**

১। মিথ্যা ২। মিথ্যা ৩। মিথ্যা ৪। সত্য ৫। মিথ্যা।

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

১। খ ২। গ ৩। ক ৪। গ ৫। খ।

# পাঠ-২

## আল-ফারাবীর অংকশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা এবং দর্শন

*Mathematics, Logic and Philosophy*

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠশেষে আপনি**

- আল-ফারাবীর অংকশাস্ত্রের পরিচয় পাবেন।
- তাঁর যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
- তাঁর দর্শনের পরিচয় পাবেন।

**ভূমিকা**

আবু নসর আল-ফারাবী বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন একদিকে গণিতবিদ এবং অন্যদিকে পদার্থবিদ। আবার তিনি যুক্তিবিদ এবং দার্শনিক হিসেবে সামধিক পরিচিত। সেকালের প্রচলিত ভাবধারা অনুযায়ী তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিন্তু চিকিৎসাকে কখনও পেশা হিসেবে গ্রহণ না করে তিনি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর দীর্ঘকালের প্রচেষ্টাকে কাজে লাগিয়ে অংকশাস্ত্রের মত দুরূহ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব ধ্যান-ধারণা প্রদান করেন। মধ্যযুগের যুক্তিবিদদের মধ্যে তিনি নিঃসন্দেহে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সামগ্রিকভাবে তাঁর দর্শনের মধ্যে যুক্তিবিদ্যা এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। তিনি পরিণত বয়সে দার্শনিক চিন্তাধারায় মনোনিবেশ করেন বলে তাঁর দর্শনের মধ্যে তাঁর নিজস্ব ভাব স্পষ্ট। এই পাঠে আমরা অংকশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা এবং দর্শনের সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে তাঁর সম্পর্কে উক্ত দিকগুলোর সত্যতা অন্বেষণ করব।

**অংকশাস্ত্র**

অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় আল-ফারাবী অংকশাস্ত্রেও একজন পণ্ডিত ছিলেন। গাণিতিক নিয়মে চিন্তাধারা প্রকাশের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর চিন্তাধারার সর্বত্রই। তিনি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আলোচনায়, এমনকি ব্যবহারিক দর্শনেও অংকের উদাহরণ দিয়ে চিন্তাধারা প্রকাশের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সূচনা করেন। আল-ফারাবী অংকশাস্ত্রকে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করেন। বিভাগগুলো হল–

(১) গণিতবিদ্যা (arithmatic)
(২) জ্যামিতি (geometry)
(৩) সমস্যার বিভিন্ন দিকের আপাতসংযোগ বিদ্যা (perspective)
(৪) জ্যোতি:শাস্ত্র বা জ্যোতির্বিজ্ঞান (astronomy)
(৫) মিউজিক (music)
(৬) গতিবিদ্যা (dynamics)
(৭) বলবিদ্যা (mechanics)।

তাঁর মতে উপরোক্ত বিজ্ঞানসমূহের দু'টি অংশ আছে। এর একটি তাত্ত্বিক এবং আরেকটি ব্যবহারিক। প্রতিটি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ দু'টি বিভাগ অবশ্য নির্ভর করে– বিজ্ঞানের বিমূর্ত ধারণা বা নীতির সংগে সংশ্লিষ্ট থাকার ওপর। আবার কলা বা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এ দু'টি অংশ নির্ভর করে এদের প্রয়োগের ওপর। তিনি উদাহরণস্বরূপ তাত্ত্বিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথা বলেন। এই বিদ্যা পার্থিব এবং স্বর্গীয় (heavenly) দ্রব্যকে তিনটি প্রেক্ষিতে আলোচনা করে। এ প্রেক্ষিতগুলো হল– (১) আকার (figure), ভর (masses) এবং আপেক্ষিক দূরত্ব (relative distance) (২) এদের সাধারণ ও বিশেষ গতি সংযোগ এবং (৩) পৃথিবী এর প্রধান অংশের সম্পর্কে এদের অবস্থান।

অন্যদিকে ব্যবহারিক জ্যোতির্বিজ্ঞান এমন পদ্ধতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেখানে গ্রহগুলোর গতি পরিভাষণের (prognosis) সূচক হিসেবে কাজ করে। এর অন্য কাজটি হচ্ছে পৃথিবীতে ঘটনাবলীকে বুঝার ইঙ্গিত নির্দেশ করা।

আল-ফারাবী জ্যোতির্বিজ্ঞানী আবু ইসহাক ইব্রাহিম বিন আব্দুল্লাহ আল-বাগদাদীর অনুরোধে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি ধৈর্যের সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানকে একটি বৈধ শাখা বলে প্রমাণ করেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ অনুসারে পৃথিবীর ঘটনাবলী হয় বিশেষ কতকগুলো কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যাকে নিশ্চিত বলে ধরা যায়, না হয় এগুলো দৈবাৎ বা আকস্মিক এবং এদেরকে নিশ্চিত বলে ধরে নেওয়ার কোন কারণ নেই। স্বর্গীয় দ্রব্য (heavenly bodies) পার্থিব ঘটনাবলীর ওপর এক প্রকারের কারণিক (causal) প্রভাব বিস্তার করে। এ প্রভাব দু' ক্যাটেগরির (প্রকারের); এর প্রথম ক্যাটেগরিতে ঐসব প্রভাব অন্তর্ভুক্ত যেগুলোকে জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় গণনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন– যেমন পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলের সূর্যের তুলনামূলক নিকটবর্তী অবস্থানে হওয়ায় অপেক্ষাকৃত উষ্ণ অঞ্চলে পরিণত হওয়া। অন্য ক্যাটেগরিকে নির্ধারণ করা যায় না। দ্বিতীয় প্রকার প্রভাবের ক্ষেত্রে জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ পূর্বলক্ষণ (auguries) এবং কল্পনাপ্রসূত গণনা নিয়ে সন্তুষ্ট হন কিন্তু এটি বিশ্বাসজনক নয়। আল-ফারাবী আরও মনে করেন যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে যারা বিখ্যাত তাঁরা নিজেদের জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় আবিষ্কার অনুসারে তাঁদের নিজস্ব কর্মকা– সমাধা করতে তেমন প্রবণতা দেখান না। ফলে আমরা ধারণা করতে পারি যে, তাঁদের পরিভাষণ (prognosis) মুনাফা লাভের জন্যই করা হয়ে থাকে।

আল-ফারাবীর অংক বা গণিত শাস্ত্রের জ্ঞানের একটি শাখা সম্পর্কে আলোচনা করে আমরা অনুধাবন করতে পারছি যে, তিনি গণিত শাস্ত্রের সাতটি বিভাগ নিয়েই গবেষণা করেছেন। তাঁর গণিতশাস্ত্রের জ্ঞানের পরিচয় বহন করে তাঁর পদার্থবিদ্যার জ্ঞান–কারণ এ দু'টি বিজ্ঞান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আংশিক নিয়মে চিন্তাধারা প্রকাশ করার সাথে তাঁর সামগ্রিক চিন্তাধারাও অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং স্বচ্ছ।

আল-ফারাবীর অংকশাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর যুক্তিবিদ্যারও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। আমরা এখন তাঁর যুক্তিবিদ্যা আলোচনা করে এর সত্যতা অনুধাবনের চেষ্টা করব।

**আল-ফারাবীর যুক্তিবিদ্যা**

মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে আল-ফারাবীকে শ্রেষ্ঠতম যুক্তিবিদ বললে অত্যুক্তি করা হবে না। তাঁকে বিশ্বের যুক্তিবিদদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুক্তিবিদ বলা হয়। যুক্তিবিদ্যায় তাঁর জ্ঞানের গভীরতার পরিমাপ করা যেতে পারে– যুক্তিবিদ্যার ওপর লিখিত তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা থেকে। তিনি এ্যারিস্টটলের যুক্তিবিদ্যার ওপর বহু ভাষ্য এবং টীকা রচনা করেন। যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত তাঁর গ্রন্থগুলো হল–

(১) কমেন্টারী অন অ্যানলাইটিকা পোস্টেরিয়া (Commentary on Analytica Posteria)
(২) কমেন্টারী অন অ্যানালাইটিকা প্রায়োরিয়া (Commentary on Analytica prioria)
(৩) কমেন্টারী অন দি ইসাগোগ (Commentary on the Isagoge)
(৪) কমেন্টারী অন টপিকা বুকস-II এবং VIII (Commentary on Topica)
(৫) কমেন্টারী অন সফিস্টিকা (Commentary on Sophistica)
(৬) কমেন্টারী অন দি ইন্টারপ্রেটেশন (Interpretatione)
(৭) কমেন্টারী অন দি ক্যাটেগরি (Commentary on De Categorie)
(৮) ন্যাশেসারী অ্যান্ড একজিসটেনসিয়াল প্রেমিজেস (Necessary and Existential Premises)
(৯) প্রপোজিশনস অ্যান্ড সেলোজিমস্ এমপ-য়েড ইন অল সায়েন্সেস (Propositions and Syllogisms Employed in all Sciences)

আল-ফারাবীর মতে যুক্তিবিদ্যা ভাষাবিজ্ঞান এবং বিশেষভাবে ব্যাকরণ থেকে পৃথক। যুক্তিবিদ্যা প্রত্যয় এবং প্রত্যয়কে অনুশাসনকারী নিয়মসমূহ (rules governing them) নিয়ে আলোচনা করে। ভ্রান্তি

থেকে দূরে থাকার উপায়সমূহও এর অন্তর্ভুক্ত। তিনি মনে করেন, এ সমস্ত নিয়মের সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং এগুলোকে মেনে চলা অপরিহার্য। তিনি আরও বলেন যে, যুক্তিবিদ্যা "বাহ্যিক" ও "অভ্যন্তরীণ" বক্তব্যের নিয়মের (rules) সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট। কারণ এসব নিয়ম মানবজাতির সমস্ত ভাষার ব্যাপারে সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য এবং এগুলো ব্যাকরণের মত গতানুগতিক নয়। তিনি স্পষ্ট ও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রকাশের জন্য যুক্তিবিদ্যাকে মোট আটটি ভাগে ভাগ করেন। এ ভাগগুলো নিম্নরূপ–

১। দি ক্যাটেগরিজ ঃ এগুলো প্রত্যয়ের নিয়ম এবং একক পদের ব্যবহার সম্পর্কিত।
২। পেরী হারমেনিয়াস ঃ এগুলো দু' বা ততোধিক পদের সমন্বয়ে গঠিত বাক্য সম্পর্কে আলোচনা করে।
৩। অ্যানালাইটিকা প্রায়োরিয়া ঃ পাঁচ প্রকারের যুক্তিতে ব্যবহৃত ন্যায়-অনুমানের নিয়ম সম্পর্কিত আলোচনা। যুক্তিগুলো হচ্ছে– (১) প্রতিপাদিত (২) দ্বান্দ্বিক (৩) সফিসটিক্যাল (৪) রেটোরিক্যাল এবং (৫) কাব্যিক।
৪। অ্যানালাইটিকা পোস্টেরিয়াঃ প্রতিপাদিত প্রমাণের নিয়ম এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রকৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।
৫। টপিকা ঃ দ্বান্দ্বিক প্রশ্ন ও উত্তরের সঙ্গে জড়িত।
৬। সফিসটিকা বা 'ভ্রান্ত জ্ঞান' ঃ ভ্রান্ত জ্ঞান এবং এ জ্ঞান থেকে দূরে থাকার উপায় নিয়ে আলোচনা করে।
৭। রেটোরিকা ঃ প্ররোচনার বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কীয় আলোচনার সঙ্গে যুক্ত।
৮। পোয়েটিকা ঃ কাব্য রচনার নিয়ম এবং বিভিন্ন ধরনের কাব্যিক বক্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কিত।

আল-ফারাবীর যুক্তিবিদ্যার উপরোক্ত আলোচনার পর তাঁর যুক্তিবিদ্যায় আলোচিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত হওয়া দরকার। আসুন, এবার আমরা এদিকে নজর দেই।

**যুক্তিবিদ্যার বিষয়বস্তু**

আল-ফারাবীর মতে, যুক্তিবিদ্যা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক চিন্তনের বিশ্লেষণই নয়, এটি জ্ঞানতত্ত্বেরও আলোচনা করে। তাঁর মতে, যুক্তিবিদ্যা ব্যাকরণ থেকে স্বতন্ত্র। কারণ ব্যাকরণ কেবলমাত্র কোন এক শ্রেণীর লোকের ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু যুক্তিবিদ্যা মানবজাতির সামগ্রিক চিন্তাধারায় ভাষার প্রকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে। বক্তব্যের সরলতম উপাদান থেকে এটা জটিলতম আকারের দিকে এবং শব্দ থেকে বাক্যে এবং যুক্তিবিন্যাসের দিকে অগ্রসর হয়।

আল-ফারাবী যুক্তিবিদ্যাকে বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়বস্তু অনুযায়ী দু'ভাগে বিভক্ত করেন। এর প্রথম ভাগে প্রত্যয় বা ধারণা এবং সংজ্ঞা (তাসাব্বুর) সংক্রান্ত মতবাদ অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় ভাগে অবধারণ, অনুমান এবং প্রমাণ (তাসদিক) সংক্রান্ত মতবাদ অন্তর্ভুক্ত। সংজ্ঞার সঙ্গে ধারণা বাহ্যিক সান্নিধ্যের (পাশাপাশি অবস্থান) মাধ্যমে শ্রেণীভুক্ত হলেও, বাস্তবতার সঙ্গে ধারণাগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ এ ধারণাগুলো সত্যও নয় আবার মিথ্যাও নয়। আল-ফারাবী এসব 'ধারণার' মধ্য থেকে সরলতম মানসিক আকারের ধারণাসমূহকে স্বীকার করেন। এ ধারণাসমূহের মধ্যে প্রথম প্রকার হল– সংবেদীয় প্রত্যক্ষণ থেকে উদ্ভূত বা জ্ঞাত একক বস্তুসমূহের প্রতিবেদন। দ্বিতীয় প্রকার ধারণা হল ঐসব ধারণা যা প্রথমটি থেকে (অর্থাৎ প্রতিবেদন থেকে) মনের ওপর মুদ্রিত হয়। এ ধরনের ধারণার উদাহরণ হল আবশ্যিক, বাস্তব এবং সম্ভাব্যের ধারণা। এরূপ প্রতিবেদন ও ধারণাসমূহ তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত। কোন মানুষের মন এগুলোর দিকে পরিচালিত হতে পারে এবং তার আত্মা এগুলোর ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠতে পারে; কিন্তু এগুলো তার নিকট প্রতিপাদিত হতে পারে না; কিংবা যা জ্ঞাত তা থেকে আহরণ করে এগুলোকে ব্যাখ্যাও করা যায় না। কারণ এ ধারণাগুলো নিজেরাই সর্বোচ্চ মাত্রার নিশ্চয়তাসহ স্পষ্ট।

আল-ফারাবীর মতে, অবধারণ হচ্ছে প্রতিবেদন বা ধারণার সংযোগকরণের ফল। এসব অবধারণ সত্য বা মিথ্যা হতে পারে। এ জাতীয় অবধারণের ভিত্তির জন্য অনুমান ও প্রমাণের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এমন

কোন যুক্তিবাক্যে উপনীত হতে হবে যা আদিতে বোধের মধ্যে নিহিত, তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট এবং স্বত:সমর্থিত। ফারাবীর মতে সমস্ত বিজ্ঞানের মত এরূপ মৌলিক যুক্তিবাক্য বা স্বত:সিদ্ধ, অধিবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র এবং নীতিশাস্ত্রের জন্য অত্যাবশ্যক।

আল-ফারাবী বলেন, প্রমাণতত্ত্বের সাহায্যে প্রারম্ভে জ্ঞাত ও সুপ্রতিষ্ঠিত কোন কিছু থেকে পূর্বে অজ্ঞাত কোন বস্তুর জ্ঞানে উত্তরণ করা যায়। তাঁর মতে, এই প্রমাণ তত্ত্বই হচ্ছে যথার্থ যুক্তিবিদ্যা। প্রত্যয়ের সঙ্গে পরিচিতি, অবধারণে এদের সমন্বয় এবং অনুমানে সমন্বয় যুক্তিবিদ্যার কেবলমাত্র ভূমিকার সূচনা করে। এগুলো ক্যাটেগরিজ, হারমেনিউটিকস এবং ফার্স্ট অ্যানালাইটিসের কাজ। কিন্তু প্রমাণ তত্ত্বের প্রধান লক্ষ্য হল সর্বজনীনভাবে বৈধ এবং প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানের মানদন্ড (Norms) অথবা নীতিসমূহ নিশ্চিত করা। তাঁর মতে, দর্শনেরও এরূপ মানদন্ড ও নীতির আবশ্যকতা আছে।

আল-ফারাবীর মতে এরকম অবস্থায় এখানে বিরোধবাধক নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এসব নীতিকে তিনি সর্বোচ্চ নীতি বলে মনে করেন। একটি একক জ্ঞানীয় ক্রিয়ার দ্বারা আমরা সত্য এবং যৌক্তিক বাক্যের অনিবার্যতার বিষয়ে অবহিত হতে পারি এবং এর বিরুদ্ধ বাক্যের মিথ্যা ও অসম্ভাব্যতা সম্বন্ধেও এ নিয়মের সাহায্যে অবহিত হওয়া যায়। একথা থেকে বুঝা যায়, আল-ফারাবী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে এ্যারিস্টটলীয় "পলিটমি" (politomy) পদ্ধতির চেয়ে প্লেটোর "ডিকোটমি" পদ্ধতিকে অধিকতর শ্রেয় মনে করেন।

সে যাহোক, আল-ফারাবী প্রমাণ তত্ত্বের আকারগত বা প্রাতিষ্ঠানিক দিক নিয়ে সন্তুষ্ট নন। এ তত্ত্ব পদ্ধতি-বিজ্ঞানের (methodology) চেয়েও আরও কিছু উচ্চস্তরের। পদ্ধতি-বিজ্ঞান কেবলমাত্র সত্য পথের ইঙ্গিত দেয়। এ তত্ত্ব সহানুমানের উপাদান হিসেবে কেবলমাত্র অবধারণ নিয়ে আলোচনা করে না, এটি বিশেষ বিজ্ঞানের প্রেক্ষিতে সত্যেরও অনুসন্ধান করে। ফলে এ তত্ত্ব কেবলমাত্র দর্শনের পরিপূরকই নয়, বরং দর্শনের অপরিহার্য অংশ। এসব কারণে আল-ফারাবী যুক্তিবিদ্যাকে দর্শনের অঙ্গ বলেন; কিন্তু তাঁর মতে, যুক্তিবিদ্যা স্বয়ং দর্শন নয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা লক্ষ্য করছি যে, প্রমাণতত্ত্ব শেষাবধি নিশ্চয়াত্মক সত্যের সঙ্গে সংগতি রেখে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানে পরিণত হয়। কিন্তু ফারাবীর মতে সম্ভাব্যতার মধ্য থেকে আমরা আবার সম্ভাব্য জ্ঞানও লাভ করতে পারি। সম্ভাব্যতার বিভিন্ন মাত্রাগুলোর বা করণপ্রণালীর (mode) (যা থেকে সম্ভাব্য জ্ঞানলাভ করা যায়) আলোচনা টপিকা, সফিস্টিকা, রেটোরিকা এবং পোয়েটিকায় করা হয়েছে। অন্যদিকে শেষোক্ত তিনটি বিষয় কেবলমাত্র ব্যবহারিক লক্ষ্যের সঙ্গে সংযুক্ত। কিন্তু ফারাবী টপিকাকেও এদের সঙ্গে যুক্ত করেন এবং দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে প্রশ্নোত্তরের বিষয়টিকে জড়িত করেন। ফারাবীর মতে, সত্যবিজ্ঞান দ্বিতীয় অ্যানালাইটিকার নিশ্চয়াত্মক যুক্তিবাক্য থেকে গড়ে ওঠে; কিন্তু ঐ সম্ভাব্যতা সত্যের অলীক মূর্তির মধ্যে ম্লান হয়ে যায়। অর্থাৎ সম্ভাব্যতার বা সত্যের সন্ধান প্রায় সময় নাও মিলতে পারে। সম্ভাব্যতার এ ব্যাপারটি দ্বান্দ্বিক অবধারণ থেকে শুরু করে কাব্যিক অবধারণ পর্যন্ত বিস্তৃত। এভাবে ফারাবীর মতে কাব্য স্কেলের একেবারে তলায় অবস্থান করে এবং এটি মিথ্যা ও অনৈতিক অযৌক্তিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। কাব্য সম্পর্কে আল-ফারাবীর এ ধরনের মন্তব্য প্লেটোর কাব্যের প্রতি অনীহার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আল-ফারাবী পারফাইরীয় ইসাগোগ গ্রন্থের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে 'সার্বিক' (Universal) সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বিশেষকে (Particular) কেবলমাত্র বস্তুসমূহে এবং ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণেই পাওয়া যায় না, চিন্তনেও পাওয়া যায়। একইভাবে সার্বিক (Universal) একক বস্তুসমূহে কেবলমাত্র অবান্তর লক্ষণ (accident) হিসেবে অস্তিত্বশীল নয়; 'দ্রব্য' হিসেবে মনেও অস্তিত্বশীল। মানবমন বস্তুসমূহ থেকে 'সার্বিক'কে বিমূর্তন করে অর্থাৎ বস্তুসমূহ থেকে বা বিশেষ থেকে সার্বিকের ধারণায় উপনীত হয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সার্বিকের অস্তিত্ব এসবের পূর্বে ছিল না। তাঁর মতে সার্বিক পূর্ব থেকেই অস্তিত্বশীল ছিল। মানবমন কেবলমাত্র এগুলোকে পরবর্তীতে উপলব্ধি করে।

যুক্তিবিদ্যায় আল-ফারাবীর সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় অন্য এক প্রেক্ষিতে। কতকগুলো প্রশ্ন যে অহেতুক দর্শনের অনেক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এটি ফারাবীর দৃষ্টি এড়ায়নি। প্রশ্নগুলো হল

মামুলী সত্তা (mere being) কি সার্বিকের সঙ্গে জড়িত? বা অস্তিত্ব কি ফলশ্রুতিতে বিধেয়? এসব ভ্রান্তিকর প্রশ্নের কোন উত্তর ছিল না। ফারাবী পূর্ণভাবে এবং বিশুদ্ধরূপে এসব প্রশ্নের উত্তর দেন। তাঁর মতে অস্তিত্ব ব্যাকরণগত বা যৌক্তিক সম্পর্কিত। এটি বাস্তবতার কোন প্রকার (category) নয়, কারণ এ প্রকার বস্তুসমূহ সম্পর্কে দৃঢ়োক্তিমাত্র। কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বয়ং সেই বস্তু ছাড়া অন্য কিছু নয়। আল-ফারাবীর এ মত আধুনিক কালের দার্শনিক কান্টের দেশ-কাল সম্পর্কিত মতবাদের ইঙ্গিত বাহক।

আমরা এতক্ষণ আল-ফারাবীর যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এতে একটি বিষয় লক্ষ্য করেছেন যে, আল-ফারাবীর মতে যুক্তিবিদ্যা দর্শনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। যুক্তিবিদ্যার উচ্চস্তরে যুক্তিবিদ্যা দর্শনে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং আল-ফারাবীর যুক্তিবিদ্যার আলোচনার পর তাঁর দর্শন আলোচনার প্রয়োজনীয়তা প্রাসঙ্গিক। এজন্য এখন আমরা তাঁর দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করব।

**আল-ফারাবীর দর্শন**

আল-ফারাবীর দর্শনের স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্য সহজেই চোখে পড়ে। তিনি পূর্ববর্তী দার্শনিকদের কোন কোন মতবাদ গ্রহণ করেন এবং মুসলিম জগতে গ্রহণযোগ্য করে এগুলোকে পুন:রূপ দান করেন। তাঁর দর্শন এমন সুসংবদ্ধ যে, প্রায় সকলের মতে এ দর্শন অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল। তাঁর দর্শন চিন্তা, প্রকাশ, যুক্তি এবং আলোচনার দিক দিয়ে শালীন ও যৌক্তিক।

আল-ফারাবীর দর্শনকে সমন্বয়ধর্মী দর্শন বলা যায়, কারণ তিনি পেরিপ্যাটেটিক দর্শনকে প্লেটোনিক আকার দিয়েছেন। এর পশ্চাতে তাঁর লক্ষ্য ছিল ইসলামের মূলনীতির সঙ্গে ঐ দর্শনকে সুসমন্বিত করে তোলা এবং ধর্মীয় সত্যকে যৌক্তিক ব্যাখ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত করা। আসলে ফারাবী দর্শনকে ধর্মীয় আবরণে প্রকাশ করেন এবং ধর্মকে দার্শনিক রূপ দান করেন। এ লক্ষ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে তিনি পেরিপ্যাটেটিক দর্শনে যে সংশোধন আনয়ন করেন, তাঁর সঙ্গে তিনি বিশ্বতাত্ত্বিক এবং মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সংযোজন করেন। এ দু'টি তত্ত্বের প্রকাশ পায়– তাঁর 'দশম চালিকাশক্তি তত্ত্বে' এবং 'বুদ্ধিবৃত্তি তত্ত্বে'। তাঁর যৌক্তিক ব্যাখ্যা আবার অন্য দু'টি তত্ত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এর একটি হচ্ছে 'নব্যায়ত তত্ত্ব' এবং অন্যটি 'কোরানের ব্যাখ্যা তত্ত্ব'। আল-ফারাবীর সমগ্র দর্শনকে এ চারটি তত্ত্বে সার-সংক্ষেপিত করা হয়েছে কারণ এসব তত্ত্ব একটি অপরটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁর এ তত্ত্বগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনাই হবে তাঁর দর্শন আলোচনা।

মুসলিম দর্শনে তাঁর 'চালিকাশক্তি তত্ত্ব' গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এ তত্ত্বটি জগৎ-আসমান, পৃথিবীর ব্যাখ্যা এবং গতি ও পরিবর্তনের ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করে। এ ব্যাখ্যাই ফারাবীর মতে, পদার্থবিদ্যা এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভিত্তি। সে যাহোক, এ তত্ত্বের প্রধান উদ্দেশ্য হল– 'এক' এবং 'বহু'র মধ্যে নিহিত সমস্যার সমাধান করা এবং পরিবর্তনশীল ও অপরিবর্তনশীলের মধ্যে তুলনা করা। আল-ফারাবী বলেন আল্লাহ এক এবং স্বয়ং অত্যাবশ্যক (necessary by Himself)। সুতরাং তাঁর অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের জন্য অন্য কারও প্রয়োজন নেই। তিনি এমন চালিকা শক্তি যিনি স্বয়ং নিজেকে জানতে সক্ষম। তিনি বুদ্ধিমান এবং সুগম্য; তাঁর সারসত্তায় তিনি অনন্য। তাঁর কোন তুলনা বা তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই।

তিনি যদি এমনই হন, তবে বিশ্বের ওপর তাঁর প্রভাব কি এবং তাঁর ও 'বহু'র মধ্যে সম্পর্ক কি? আল-ফারাবী এ প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য নির্গমন তত্ত্বের সাহায্য গ্রহণ করেন। আল-ফারাবী বলেন, একক নিশ্চয়াত্মক সত্তার নিজস্ব জ্ঞান ও সদিচ্ছা বা মঙ্গলের দ্বারা প্রথমে এক শক্তির নির্গমন হয়। এই নির্গত শক্তিই প্রথম চালিকাশক্তি (first intelligence)। এখানে জ্ঞানই সৃষ্টির সমার্থক। কারণ কোন বস্তুর ধারণা পোষণ করার অর্থই হল এর অস্তিত্ব। প্রথম চালিকাশক্তি স্বয়ং সম্ভাব্য, কিন্তু অন্যের নির্গমনের প্রেক্ষিতে নিশ্চয়াত্মক। এ শক্তি পরম এককের এবং নিজের চিন্তা করে। এটি নিজের সত্তায় এক এবং এসবের বিবেচনায় বহু। আল-ফারাবী এ সূত্র থেকেই বহুত্বের উদ্ভবের পথে অগ্রসর হন। প্রথম চালিকাশক্তির পরম একত্বের চিন্তা থেকেই আরেকটি চালিকাশক্তি নির্গমন হয়। নিজেকে সম্ভাব্য ভাবার

ফলে এ চালিকাশক্তি থেকে প্রথম "আগমনের" উপাদান ও আকারের নির্গমন হয়, কারণ প্রতিটি বলয়ের নিজস্ব বিশিষ্ট আকার আছে এবং এ আকারটি এর আত্মা। এভাবে চালিকাশক্তির একের পর এক নির্গমন হতে থাকে দশম চালিকাশক্তি পর্যন্ত। এর সাথে নয়টি বলয় এবং এদের নয়টি আত্মারও নির্গমন হয়। নিযুক্তক বা প্রতিনিধি চালিকাশক্তি বা দশম ও শেষ চালিকাশক্তি পার্থিব জগতকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই চালিকাশক্তি থেকেই মানুষের আত্মার এবং চারটি উপাদানের নির্গমন হয়। এ চারটি উপাদান হল খনিজ পদার্থ, উদ্ভিদ, প্রাণী এবং সর্বশেষে মানুষ।

প্রথম চালিকাশক্তিসহ এসব শক্তির সংখ্যা দশটি। নয়টি চালিকাশক্তির সঙ্গে গ্রহ নক্ষত্র এবং বলয়সমূহ জড়িত এবং এগুলো ও আত্মাসমূহ গতির উদ্ভাবক। প্রতিটি বলয়ের নিজস্ব চালিকাশক্তি এবং আত্মা আছে। দশম চালিকাশক্তি পার্থিব জগতের যাবতীয় বিষয়াদির ব্যবস্থা করে। আত্মা বলয়ের নিকটবর্তী চালক এবং আত্মা চালিকাশক্তি থেকে ক্ষমতা অর্জন করে। আত্মা এর কামনার মাধ্যমে চালিকাশক্তির জন্য গতিশীল হয়। সুতরাং এর কামনাই এর গতির উৎস। অন্যদিকে চালিকাশক্তি সর্বদাই কামনার জগতে থাকে। নিম্নতর উচ্চতরের কামনা করে এবং এভাবে সকলেই পরম এককে কামনা করে। এই পরম এককেই প্রাইম মুভার বা 'প্রধান চালক', যদিও নিজে অচালিত।

আল-ফারাবী এভাবে চালিকাশক্তি তত্ত্বের মাধ্যমে গতি ও পরিবর্তনের সমস্যাটির সমাধান করেন। তিনি এক এবং বহুর সমস্যাটি সমাধানের জন্যও এই তত্ত্বটি ব্যবহার করেন। উপাদান দশটি চালিকাশক্তির মতই পুরাতন; কিন্তু উপাদান সৃষ্ট, কারণ উপাদান দশ চালিকাশক্তি থেকে নির্গত। আল্লাহ্‌র এককত্ব প্রমাণের জন্য তিনি এই দশ চালিকাশক্তির মধ্যস্থতা গ্রহণ করেন।

**বুদ্ধিবৃত্তি তত্ত্ব**

আল-ফারাবীর দর্শনে বুদ্ধিবৃত্তির আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ বুদ্ধিবৃত্তি চালিকাশক্তির সঙ্গে জড়িত। এজন্য আমরা এখন তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি তত্ত্বের আলোচনা করব। আল-ফারাবী তাঁর "On the Different Meanings of the Intellect" গ্রন্থে বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেন। তিনি জ্ঞানতত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত বুদ্ধিবৃত্তি তত্ত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাঁর গ্রন্থসমূহের বেশ কিছু অংশে এ তত্ত্বের উল্লেখ করেন। তিনি বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কীয় এ সমস্যাকে তাঁর দর্শনের সঙ্গে যুক্ত করেন; কারণ তিনি অনুভব করেন যে, এ তত্ত্ব "দশ চালিকাশক্তি তত্ত্ব" এবং "নব্যায়ত তত্ত্বের" সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

আল-ফারাবী বুদ্ধিবৃত্তিকে 'ব্যবহারিক বুদ্ধিবৃত্তি' এবং 'তাত্ত্বিক বুদ্ধিবৃত্তি'তে বিভক্ত করেন। তাঁর মতে, ব্যবহারিক বুদ্ধিবৃত্তি অনুমান করে 'কি করা উচিত'। অপরদিকে তাত্ত্বিক বুদ্ধিবৃত্তি আত্মার পূর্ণতা অর্জনে সহায়তা করে। তাত্ত্বিক বুদ্ধিবৃত্তিকে তিনি 'জড়ীয়' বা 'উপাদানগত', 'স্বভাবজাত', এবং 'অর্জিত' (Material, habitual and acquired) এ তিনভাগে বিভক্ত করেন। উপাদানগত বা সম্ভাব্য বুদ্ধিবৃত্তি হল আত্মা বা আত্মার অংশ বা এমন একটি শক্তি যা বস্তুর সারাংশকে বুঝায় এবং যার বিমূর্তন করার ক্ষমতা আছে। এটিকে এমন উপাদানের সঙ্গে তুলনা করা যায় যার ওপর বস্তুর আকারের ছাপ অঙ্কিত; যেমন গালার ওপর সীলমোহর অঙ্কন করা যায়। এগুলোকে অভিলিখন বলা হয়। এই অভিলিখনগুলো প্রত্যক্ষণ ও সুবোধ্য (intelligibles) ব্যতীত আর কিছু নয়। সুতরাং সুবোধ্য-সম্ভাব্যতায় বস্তুর মধ্যে অস্তিত্ববান হয় এবং ইন্দ্রিয় থেকে এগুলোকে যখন বিমূর্তন করা হয় তখন এগুলো বাস্তবতায় মনের মধ্যে অস্তিত্বশীল হয়। এটিই হল প্রত্যক্ষণ এবং বিমূর্তন (abstraction)। এগুলো মনের গুরুত্বপূর্ণ কর্ম যার ফলে মন সম্ভাব্যতা থেকে বাস্তবতায় সুবোধ্যকে (intelligibles) আনয়ন করে। এই সুবোধ্যগুলো মনে বাহিত হলে বুদ্ধিবৃত্তি সুপ্ত অবস্থা থেকে সক্রিয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়।

**সুপ্ত ও সক্রিয় বুদ্ধিবৃত্তি**

এই অবস্থায় সক্রিয় বুদ্ধিবৃত্তি বা স্বভাবজাত বুদ্ধিবৃত্তি কতকগুলো সুবোধ্যকে অর্জনের ব্যাপারে মনের একটি আনুভূমিকে বা সমতলে আরোহণ কত। মন যেহেতু সব সুবোধ্যকে একই সঙ্গে বোধে আনতে সক্ষম নয় বা অন্যকথায় হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম নয়, সেহেতু এটি সক্রিয় বুদ্ধিবৃত্তি যা প্রত্যক্ষণ করে

তাঁর প্রেক্ষিতে এবং যা প্রত্যক্ষিত হয়নি তার প্রেক্ষিতে। ফলে এটি সুপ্ত বুদ্ধি। সুবোধ্যগুলো স্বয়ং সুপ্ত অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অস্তিত্বশীল থাকে।

সুবোধ্যগুলোকে (ইন্দ্রিয় থেকে) উন্মোচিত করা হলেই সেগুলো সক্রিয় বুদ্ধিবৃত্তিতে পরিণত হয় এবং মানুষ এই আনুভূমিকের বা সমপর্যায়ের সক্রিয় বুদ্ধিবৃত্তি লাভ করলে, সে নিজেকে বুঝতে সক্ষম হয়। এই ধরনের বোধের সঙ্গে বাহ্যিক জগতের কোন সম্পর্ক নেই। এটি মানসিক বিমূর্ত বোধ।

বুদ্ধিবৃত্তি একবার এভাবে বিমূর্তনকে হৃদয়ঙ্গম করতে বা বুঝতে সক্ষম হলে এটি আরও উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়ে অর্জিত বুদ্ধিবৃত্তিতে পরিণত হয়। এটি অসময়ে এমন স্তরে পৌঁছে, যে স্তরে পৌঁছলে মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তি এমন বিমূর্তকে ধারণ করে যার সঙ্গে জড়ের কোন সংযোগ থাকে না। ফলে এটি যৌক্তিক ধারণার রূপ লাভ করে।

এই যৌক্তিক ধারণা এবং ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষণের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, যৌক্তিক ধারণা এ পর্যায়ে এক প্রকার সংজ্ঞা এবং অনুপ্রেরণায় পরিণত হয় বা অন্যকথায় এক প্রকার তাৎক্ষণিক বোধে পরিণত হয়। এটিই হল মানবীয় বোধের মহত্তম পর্যায়। এই অর্জিতবোধে (Level) কতিপয় এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষ পৌঁছতে পারে। এ স্তরে কেউ পৌঁছলে তাঁর নিকট গোপন রহস্য উন্মোচিত হয় এবং তিনি স্বতন্ত্র চালিকাশক্তির (separate intelligence) সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হন।

এভাবে ক্রমান্বয়ে বুদ্ধিবৃত্তি 'সুপ্ত' থেকে 'সক্রিয়' এবং 'সক্রিয়' থেকে 'অর্জিত' বুদ্ধিবৃত্তিতে উন্নীত হয়। সুপ্ত বুদ্ধিবৃত্তি কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়জাত আকার গ্রহণকারী, আর সক্রিয় বুদ্ধিবৃত্তি সুবোধ্যকে (intelligibles) সংরক্ষণ করে এবং ধারণাকে বুঝে। অর্জিত বুদ্ধিবৃত্তি যোগাযোগ, আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের অনুভূতি এবং প্রেরণার পর্যায়ে উন্নীত হয়।

ক্রমান্বয়ে এ ধরনের এক স্তর থেকে আরেক স্তরে উত্তরণ স্বত:স্ফূর্ত নয়। কারণ এর প্রারম্ভিক স্তরে সুবোধ্য এবং বুদ্ধিবৃত্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকে। এর সম্ভাব্যতা থেকে বাস্তবতায় উত্তরণ কেবলমাত্র প্রতিনিধি চালিকাশক্তি বা সর্বশেষ চালিকাশক্তির প্রভাবের ফলেই ঘটে। মানবীয় জ্ঞান স্বতন্ত্র চালিকাশক্তির বিচ্ছুরণের (radiation) ওপর নির্ভর করে এবং প্রতিনিধি চালিকাশক্তি (agent intelligence) আমাদের চক্ষুর সঙ্গে সূর্যের সম্পর্কের মত মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তির সাথে একই রকমভাবে সম্পর্কিত হয়। আমাদের চক্ষু দৃষ্টির জন্য দিবালোকের ওপর নির্ভরশীল এবং একইভাবে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি কেবল তখনই বোধের জগতে প্রবেশ করে যখন প্রতিনিধি চালিকাশক্তি ঐ বুদ্ধিবৃত্তিকে উন্মোচিত করে (অর্থাৎ এর সামনে থেকে পর্দা সরিয়ে নেয়)। এই চালিকাশক্তি বুদ্ধিবৃত্তির পথ আলোকিত করে। এখানেই আমরা দেখতে পাই যে, মরমীবাদ দর্শনের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। তবে এ তত্ত্বে মানুষের মনকে কিছু অবমূল্যায়িত করা হয়। কারণ প্রতিনিধি চালিকাশক্তির প্রভাব ছাড়া মন আর উর্ধ্বলোকের দিকে অগ্রসর হতে পারে না। এ কারণেই হয়তো সুফীরা আল-ফারাবীর এ তত্ত্বকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নেননি। কিন্তু এতদ্সত্বেও আল-ফারাবীর এ তত্ত্ব মুসলিম দর্শনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এমনকি খ্রিষ্ট দর্শনেও এর গুরুত্ব কম ছিল না।

**নব্যুয়ত তত্ত্ব**

দর্শনে নব্যুয়ত তত্ত্ব বুদ্ধিবৃত্তি তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত এবং এ তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আল-ফারাবীর। তিনি নব্যুয়তের ধর্মীয় ব্যাখ্যাকে দার্শনিক ভিত্তি প্রদানের চেষ্টা করেন। বুদ্ধিবৃত্তির আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি যে, প্রতিনিধি চালিকাশক্তির প্রভাবে অর্জিত বুদ্ধিবৃত্তি আলোকপ্রাপ্ত হয়ে অনন্ত রহস্যের সন্ধানপ্রাপ্ত হয়। এ অবস্থায় অর্জিত বুদ্ধিবৃত্তি প্রতিনিধি চালিকাশক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং অনুপ্রাণিত হয়। আল-ফারাবী নব্যুয়তের বিষয়টিকে সরাসরি আল্লাহপ্রদত্ত না বলে উপরোক্ত বুদ্ধিবৃত্তির আলোচনার সঙ্গে সংযুক্ত করেন এবং এটিকে দার্শনিক রূপ দেন। এ তত্ত্বে ঐতিহ্যবাদের (traditionalism) সঙ্গে যৌক্তিকতার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর

মনোবিজ্ঞানে ও অধিবিদ্যায় এই তত্ত্বের ভিত্তি লক্ষণীয়। আল-ফারাবীর রাষ্ট্রদর্শন ও নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে এ তত্ত্ব সম্পর্কিত।

আল-ফারাবী সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের প্রভাবের গুরুত্ব অনুধাবন করে সমাজ ও আদর্শ রাষ্ট্রের চিন্তা করেন। তিনি সমাজ ও আদর্শ রাষ্ট্রের প্রধান নেতার যে গুরুত্ব ও গুণাবলীর উল্লেখ করেন তা প্রায় প্লেটোর দার্শনিক রাজার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু দার্শনিক রাজার যে গুণটির কথা প্লেটো চিন্তা করেননি, আল-ফারাবী তা চিন্তা করে প্রধান নেতার গুণাবলীর সঙ্গে যুক্ত করেন। এ গুণটি হচ্ছে সাধনা বলে এই প্রধানকে প্রতিনিধি চালিকাশক্তির আনুভূমিকে বা লেভেলে পৌঁছতে হবে এবং তিনি সে স্তরে পৌঁছলে প্রত্যাদেশ ও অনুপ্রেরণা (revelation and inspiration) লাভ করবেন। প্রত্যাদেশ ও অনুপ্রেরণা প্রাপ্ত হলে প্রধান নেতা শুধু জাগতিক নয়, পারলৌকিক বিষয়েও নেতৃত্ব দান করতে পারবেন। কারণ তিনি তখন স্বর্গীয় আলোকপ্রাপ্ত। ফারাবীর মতে কেবলমাত্র দার্শনিক এবং মহান সাধকগণ এই আলোকপ্রাপ্ত হয়ে গুপ্ত রহস্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আলোর জগতকে প্রত্যক্ষণ করতে সক্ষম হন। "এই পবিত্র আত্মা' ঊর্ধ্বলোকের প্রতি নিবিষ্টচিত্ত থাকায় অধঃলোকের প্রতি কর্ণপাত করবে না এবং এর বাহ্যিক সংবেদন অভ্যন্তরীণ সংবেদনকে আচ্ছন্ন করতে পারবে না। এই আত্মার প্রভাব অন্যান্যদেরকে প্রভাবিত করবে এবং স্বীয় দেহের ঊর্ধ্বে আরোহণ করে এই পৃথিবীর সমস্ত বস্তুকে প্রভাবিত করবে। "High Spirit" এবং ফেরেস্তাদের নিকট থেকে এ আত্মা জ্ঞান লাভ করবে। আল-ফারাবী তাঁর আস-শামারাত আল-মারাদিয়্যাহ গ্রন্থে মহান আত্মা সম্পর্কে উপরোক্ত উক্তির মাধ্যমে এসব গুণাবলীর উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, নিরবচ্ছিন্ন ধারণামূলক অধ্যয়ন বা অনুশীলনের সাহায্যে ঐ আত্মা প্রতিনিধি চালিকাশক্তির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারবেন। তাঁর মতে এ রকম আত্মার অধিকারী হবেন মহান নবী।

আল-ফারাবী আরও বলেন যে, প্রতিনিধি চালিকাশক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন কল্পনা (imagination), স্বপ্ন এবং দিব্যদৃষ্টির (vision) মাধ্যমেও সম্ভব। কল্পনাশক্তির মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জগতের আদলে মানসিক প্রতিরূপ সৃষ্টি করা যায়। এ অবস্থায় নিদ্রামগ্ন ব্যক্তি স্বর্গ এবং এর অধিবাসীদেরকে অবলোকন করতে পারেন এবং অপার আনন্দ অনুভব করেন। কল্পনা স্বর্গীয় কল্যাণময় জগতে আরোহণ করতে পারে এবং প্রতিনিধি চালিকাশক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে কোন বিশেষক্ষেত্রে স্বর্গীয় রায় ও ব্যক্তিগত ঘটনাবলীর বিষয় অবগত হতে পারে। দিনে বা রাত্রে সংঘটিত এ যোগাযোগের মাধ্যমে নব্যুয়ত কে (Prophesy) ব্যাখ্যা করা যায় কারণ এটিই সত্যস্বপ্ন এবং প্রত্যাদেশের উৎস। এখানে উল্লেখ্য যে, এই কল্পনাশক্তি সাধারণ কল্পনা নয়, এটি অর্জিত সৃজনশীল কল্পনা।

আল-ফারাবীর মতে যিনি এভাবে নব্যুয়তপ্রাপ্ত হন তিনি নবী। এ নবীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল–স্পষ্ট কল্পনা অর্জন যার মাধ্যমে তিনি জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায় প্রতিনিধি চালিকাশক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন এবং দিব্যদৃষ্টি ও অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারবেন। তাঁর মতে প্রত্যাদেশ প্রতিনিধি চালিকাশক্তির মাধ্যমে আল্লাহর তরফ থেকে নির্গমন ছাড়া আর কিছু নয়। কিছু লোকের অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী কল্পনার মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত কম মাত্রার দিব্যদৃষ্টি এবং অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারেন। আল-ফারাবী এঁদেরকে নবীর চেয়ে কম মাত্রার মহাপুরুষ বলে অভিহিত করেন। সাধারণ লোকের কল্পনা অত্যন্ত দুর্বল হওয়ায় দিনে বা রাত্রে তাদের পক্ষে প্রতিনিধি চালিকা শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব নয়। সংক্ষেপে এটিই হল তাঁর নব্যুয়ত তত্ত্ব।

ফারাবীর এই নব্যুয়ত তত্ত্ব নি:সন্দেহে নব্যুয়তের ব্যাপারে প্রত্যাদেশ এবং যুক্তির বা ধর্ম এবং দর্শনের সুষ্ঠু সমন্বয়ের প্রয়াস। তাঁর এ তত্ত্বে এ্যারিস্টটলের প্রভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু এ্যারিস্টটলের সঙ্গে ফারাবীর পার্থক্য বেশ স্পষ্ট। এ তত্ত্বের প্রভাব মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে লক্ষণীয়। ইবনে সিনা এ তত্ত্বের অনুকরণ করেন। ইবনে রুশ্‌দ এ তত্ত্বের বৈধতা স্বীকার করেন এবং এ ব্যাপারে আল-গাযালীর সমালোচনায় বিস্মিত হন। ইহুদী মাইমোনীওল এ তত্ত্বের অনুসরণ করেন এবং স্পিনোজার ট্রাকটেটাল থেওলজিকো–পলিটিকাসেও এ ধরনের তত্ত্ব লক্ষণীয়।

**আল-ফারাবীর কোরানের বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যাতত্ত্ব**

পবিত্র কোরানের কিছু ধর্মীয় নীতি ঐতিহ্যগত (traditional)। এগুলোকে যুক্তির সাহায্যে প্রতিপাদন করা যায় না যেমন মোজেজা (miracle), বিচার দিবস, শেষদিবস, পুলসেরাত, বিচার এবং শাস্তি। এসব সামিয়াতকে গ্রহণ করে নেওয়া ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ। বিশ্বাসীদেরকে এগুলো গ্রহণ করতে হবে এবং তদানুসারে কাজ করতে হবে। কিন্তু কিছু চিন্তাবিদ এগুলোর ভিন্ন ব্যাখ্যা বা যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেন বা এগুলোকে প্রাকৃতিক আইনের আওতায় আনার চেষ্টা করেন। মুতাজিলারা এ দলভুক্ত। এছাড়া আরও কিছু চিন্তাবিদ আছেন যেমন ইবনে রাওয়ান্দি এবং আল-রাজী।

আল-ফারাবী এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি মোজেজার (miracle) বৈধতা স্বীকার করে বলেন, এগুলো নব্যুয়তের প্রমাণের উপায়। তিনি মনে করেন মোজেজা অতিপ্রাকৃতিক হলেও প্রাকৃতিক আইনের বিরোধী নয়– কারণ এগুলোর উৎস বলয়ের জগতে এবং চালিকাশক্তিতে দেখা যায়। এরাই স্বর্গীয় মন্ডলের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত। কাজেই ঐ জগতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হলেই স্বভাবগত বিষয়ের বাইরের এসব ঘটনা ঘটে। একজন নবী তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবলে প্রতিনিধি চালিকাশক্তির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। এই সংযোগের ফলে তিনি বৃষ্টিপাত ঘটান, চন্দ্রকে দু'খন্ডে বিভক্ত করেন, লাঠিকে সাপে পরিণত করেন বা অন্ধ এবং অসুস্থ রোগীকে সুস্থ করে তোলেন। এভাবে আল-ফারাবী কার্যকারণকে স্বভাবগত বিষয়ের ঊর্ধ্বের বিষয়ে পরিণত করেন। তিনি লওহে মাহফুজ এবং কালকে শাব্দিক অর্থে না বুঝে সংক্ষেপিতকরণ ও সংরক্ষণের অর্থে বুঝার কথা বলেন। তাঁর মতে কোনো বিশ্বাসীই এগুলোর অবমূল্যায়ন করতে পারে না।

আল-ফারাবীর এই মনোভাব নি:সন্দেহে আধ্যাত্মিকতার মনোভাব। ইবনে সিনা এ তত্ত্বকে গ্রহণ করে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। আল-গাযালী এ তত্ত্বের সমালোচনা করেন। কিন্তু ইবনে রুশ্দ বলেন, এসব বিষয়ের নিরাপত্তার কারণে এখানে দর্শন ও ধর্মকে আলাদা রাখা উচিত। উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আল-ফারাবীর দর্শনের মোটামুটি একটি চিত্র আমাদের সামনে ফুটে ওঠে।

**অনুশীলনী**

১। আল-ফারাবীর যুক্তিবিদ্যার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিন। তাঁর দর্শনের সঙ্গে যুক্তিবিদ্যার সম্পর্ক কি?

২। আল-ফারাবীর চালিকাশক্তি তত্ত্ব এবং বুদ্ধিবৃত্তি তত্ত্বের আলোচনা করুন। চালিকাশক্তি তত্ত্বের সঙ্গে নব্যুয়ত তত্ত্বের কি কোন সম্পর্ক আছে? চিন্তা করে আলোচনা করুন।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

**সত্য/মিথ্যা**

১। অংকশাস্ত্রে আল-ফারাবীর কোন অবদান নেই। সত্য/মিথ্যা
২। আর-ফারাবী যুক্তিবিদ্যাকে আটভাগে ভাগ করেন। সত্য/মিথ্যা
৩। আল-ফারাবীর মতে প্রমাণ তত্ত্বই যথার্থ যুক্তিবিদ্যা নয়। সত্য/মিথ্যা
৪। আল-ফারাবীর দর্শনকে সমন্বয়ধর্মী দর্শন বলা যায়। সত্য/মিথ্যা
৫। আল-ফারাবী বুদ্ধিবৃত্তিকে তিনভাগে ভাগ করেন। সত্য/মিথ্যা।

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

১। আল-ফারাবীর অংকশাস্ত্র ও যুক্তিবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য
(ক) নেই (খ) আছে
(গ) সামান্য (ঘ) ওপরের কোনটিই নয়।

২। আল-ফারাবীর মতে অবধারণ হচ্ছে
(ক) প্রতিবেদন (খ) প্রতিপাদন
(গ) ধারণা (ঘ) কোনটিই নয়।

৩। আল-ফারাবীর মতে চালিকাশক্তি
(ক) বারটি (খ) দশটি
(গ) ষোলটি (ঘ) ওপরের কোনটিই নয়।

৪। আল-ফারাবীর বুদ্ধিবৃত্তি
(ক) চার প্রকার (খ) নয় প্রকার
(গ) কোন প্রকারভেদ নেই (ঘ) ওপরের কোনটিই নয়।

৫। আল-ফারাবীর মতে প্রত্যাদেশ হল চালিকাশক্তির মাধ্যমে
(ক) প্রেরিত (খ) নির্গমন
(গ) প্রতিপাদন (ঘ) কোনটিই নয়।

**রচনামূলক প্রশ্ন**

১। আল-ফারাবীর যুক্তিবিদ্যা আলোচনা করুন। তাঁর মতে যুক্তিবিদ্যা কি দর্শনের হাতিয়ার?
২। আল-ফারাবীর 'দশ চালিকাশক্তি তত্ত্ব' ব্যাখ্যা করুন এবং আপনার মন্তব্য লিখুন।
৩। আল-ফারাবীর 'বুদ্ধিবৃত্তিতত্ত্ব' সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন এবং আল-কিন্দির এ তত্ত্বের সঙ্গে পার্থক্য কোথায় তা নির্ণয় করুন।

**উত্তরমালা**

**সত্য/মিথ্যা**

১। মিথ্যা ২। সত্য ৩। মিথ্যা ৪। সত্য ৫। মিথ্যা

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

১। খ ২। ক ৩। খ ৪। ক ৫। খ

# পাঠ-৩

## *আল-ফারাবীর অধিবিদ্যা*

## *Metaphysics of Al-Farabi*

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ শেষে আপনি**

- আল-ফারাবীর সত্তার ধারণার পরিচয় পাবেন।
- পরম সত্তা সম্পর্কে ফারাবীর ধারণা জ্ঞাত হবেন।
- আল-ফারাবীর অধিবিদ্যার পূর্ণ পরিচয় পাবেন।

**ভূমিকা**

আল-ফারাবীর চিন্তাধারার গভীরতার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর অধিবিদ্যায়। যুক্তিবিদ্যার মত অধিবিদ্যায় তাঁর মৌলিক অবদানের জন্য তিনি খ্যাত। ফারাবীর বিজ্ঞানের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু দখল করে আছে পদার্থবিদ্যা এবং অধিবিদ্যায়। তাঁর অধিবিদ্যা আবার তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্ব ও নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায় আল-ফারাবীর অধিবিদ্যক আলোচনা তাঁর সামগ্রিক দর্শনের মূল বিন্দুতে পরিণত হয়েছে। মুসলিম দর্শনে সত্তা, পরমসত্তা এবং বিশ্বজগতের আলোচনাই মুখ্য আলোচনা। এ হিসেবে ফারাবীর সুশৃঙ্খল দর্শনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখব তাঁর অধিবিদ্যার আলোচনা এ দর্শনের মধ্যস্থানে অবস্থিত। এবার আমরা তাঁর অধিবিদ্যা আলোচনা করে দেখি তাঁর অধিবিদ্যা সম্পর্কে উপরোক্ত বক্তব্য কতটুকু সত্য।

সত্তা, পরমসত্তা এবং বিশেষ বিজ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ প্রতিপাদনের মুখ্য নীতিসমূহের আলোচনার নাম, ফারাবীর মতে, অধিবিদ্যা। অধিবিদ্যার এই সংজ্ঞা থেকে তিনটি মুখ্য বিষয় পাওয়া যায়। এর প্রথমটি হল সত্তা, দ্বিতীয়টি পরমসত্তা বা আল্লাহ এবং আল্লাহর ধারণায় পৌঁছানোর জন্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদি এবং তৃতীয়টি হল বিশেষসমূহের প্রতিপাদনের মূলনীতিসমূহ।

অধিবিদ্যার উপরোক্ত সংজ্ঞা এবং এর মধ্যে নিহিত বিষয়াবলীর দিকে লক্ষ্য রেখে আল-ফারাবী অধিবিদ্যাকে তিনভাগে ভাগ করেন। বিভাগগুলো নিম্নরূপ–

১। সত্তার অস্তিত্বের আলোচনা বা সত্তাতত্ত্ব (ontology)

২। অজড়ীয় দ্রব্যসমূহ, তাদের প্রকৃতি, সংখ্যা এবং তাদের উৎকর্ষের মাত্রার আলোচনা। এই আলোচনা পরিশেষে পরমসত্তায়, যার চেয়ে আর বৃহত্তম কোন কিছুর ধারণা করা যায় না এমন এক পরম সত্তার আলোচনায় পরিণত হয়। এ সত্তা সমুদয় বস্তুসমূহের সর্বোচ্চ বা চূড়ান্ত নীতি যা থেকে প্রতিটি বস্তু এর সত্তা লাভ করে। এই বিভাগটিকে বলা হয় ধর্মতত্ত্ব।

৩। তৃতীয় বিভাগটি বিশেষ বিজ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ প্রতিপাদনের মুখ্য নীতিসমূহের আলোচনা।

আল-ফারাবীর মতে, এ তিনটি অংশের বিষয়বস্তুর সমন্বিত আলোচনার নামই অধিবিদ্যা। তিনি তাঁর অধিবিদ্যা আলোচনায় এ্যারিস্টটলের তথাকথিত ধর্মতত্ত্বের (Theologica) সাহায্য গ্রহণ করেন।

এবার আমরা প্রথমে প্রথম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু 'সত্তাতত্ত্ব' নিয়ে আলোচনা করব।

দর্শনের যে শাখায় অস্তিত্বের স্বরূপ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তত্ত্বের আলোচনা করা হয়– সেই শাখাটি হল অনটোলজি বা সত্তার (being) আলোচনা বিষয়ক শাখা। আল-ফারাবী এ শাখায় সত্তা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে চরমতম এবং বিশ্বজনীন ধারণা হল সত্তার ধারণা। সত্তাকে সংজ্ঞায়িত করা যায় না, কারণ সত্তা সকল ধারণার পূর্ববর্তী এবং সরলতম ধারণা। কোন ধারণা বা

প্রত্যয়ের সংজ্ঞায়িত করার অর্থ হল এর আধেয় বা বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণ করা। কিন্তু সত্তার কোন আধেয় না থাকায়, সত্তাকে চিন্তনমূলক উপাদানের মধ্যে আনয়ন করা কঠিন; কারণ সত্তা নিজেই এ কর্মে বাঁধা দেয়। সত্তাকে শব্দের সাহায্যে সংজ্ঞায়িত করার প্রচেষ্টা কেবলমাত্র আমাদের মনকে এর দিকে মনোযোগী করে নির্দেশিত করে, কিন্তু এর ধারণার ব্যাখ্যা করে না– কারণ যেসব শব্দের দ্বারা ধারণাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়– সত্তার ধারণা তার চেয়েও পরিষ্কার। এক সময় আল-ফারাবী, এ সত্তাকে (being) বাস্তবায়নের (reality) সঙ্গে একীভূত করেন অনেকটা পারমিনাইডিসের পদ্ধতিতে।

আল-ফারাবী সত্তাকে দু'ভাগে ভাগ করেন। এর একটি হল অনিবার্য সত্তা, অন্যটি সম্ভাব্য সত্তা। অনিবার্য সত্তা স্বয়ং অস্তিত্বশীল বা এই সত্তা এমন যা অস্তিত্বশীল না হয়ে পারে না। এর অনস্তিত্বের কথা অচিন্তনীয়, যেমন পরমসত্তা খোদার অস্তিত্ব পূর্ণভাবে নিশ্চিত। তাঁর অস্তিত্বের কারণ তিনি নিজেই। নিজেই যিনি তাঁর নিজ অস্তিত্বের কারণ– এটিই তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ। এই অনিবার্য সত্তা অন্য সব বস্তুর অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য। এই পরম সত্তার মধ্যে সত্য ও বাস্তবতা একীভূত হয়ে আছে। এই অনিবার্য সত্তা এক এবং একাধারে বাহ্য ও অন্তর, অন্তরব্যাপী এবং অন্তর্বর্তী। তাঁর মতে এই একক পরম অনিবার্য সত্তাই আল্লাহ।

আল-ফারাবীর মতে, সম্ভাব্য সত্তা (contingent being) হল সেই সত্তা যা অন্যের নিকট থেকে এর অস্তিত্ব গ্রহণ করে বা অন্যের দ্বারা অস্তিত্ববান হয়। এর অনস্তিত্ব চিন্তনীয় বা সম্ভাব্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– এই পৃথিবী এবং এর অভ্যন্তরীণ বস্তুসমূহ সম্ভাব্য সত্তা কারণ এরা পরম সত্তার দ্বারাই অস্তিত্ববান।

আল-ফারাবী এ্যারিস্টটলীয় দর্শনের অনুসরণ করে বলেন যে, সম্ভাব্যতা (potentiality) হচ্ছে অস্তিত্বশীল হওয়ার ক্ষমতা। প্রত্যেকটি সৃজিত বস্তু প্রকৃত অর্থে অস্তিত্বশীল হওয়ার পূর্বে অস্তিত্বশীল হওয়ার সম্ভাবনার মধ্যে ছিল। অর্থাৎ ঐ বস্তু সুপ্ত অবস্থায় বা সম্ভাব্যতায় (potentiality) নিহিত ছিল। বাস্তবতা (actuality) হল বাস্তবেই যা অস্তিত্বশীল। আল-ফারাবীর মতে, যা বাস্তবতায় অস্তিত্বশীল তা পূর্ণ এবং যা সম্ভাব্যতায় অস্তিত্বশীল হওয়ার জন্য অপেক্ষমান তা সম্ভাব্য বলে অপূর্ণ এবং এ সত্তাই ভবন (becoming)। তাঁর মতে, কেবলমাত্র আল্লাহ-ই কার্য বা কারণ এসবে তা ইঙ্গিত করে না। কারণ কোন বস্তু আসলেই অস্তিত্বশীল কিনা তা না জেনেই, এর সারধর্ম সম্পর্কে চিন্তা করা যায়। কিন্তু অনিবার্য সত্তা সম্পর্কে তা করা যায় না। তাই একমাত্র এক পরম সত্তাই হলেন আল্লাহ যার সারধর্মই হচ্ছে তাঁর অস্তিত্ব।

আল-ফারাবী, আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য সারধর্ম এবং অস্তিত্বের মধ্যে যৌক্তিক পৃথকীকরণের ওপর জোর দেন। তাঁর মতে, আল্লাহ স্বয়ং অস্তিত্বশীল এবং অনিবার্য সত্তা যিনি পূর্ণ বাস্তবতা বলে পূর্ণতম। সারধর্ম এবং অস্তিত্বের মধ্যে দ্বৈততা নেই বলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি অস্তিত্ববান এবং সম্পূর্ণরূপে একক সত্তা।

আল-ফারাবীর মতে সৃষ্টবস্তু দুটি নিয়মের সমন্বয়ে গঠিত। নিয়ম দুটি হচ্ছে জড় ও আকার (matter and form)। জড় বা বিস্তৃতি দ্রব্যত্ব (substratum) ছাড়া আর কিছু নয়। এ দ্রব্যত্ব অনির্ধারিত। আকার অনুযায়ী কোন বস্তুতে পরিণত হওয়াই এর একমাত্র ধর্ম। আকারই মূলনীতি। এই আকার জড় কোন্ বস্তুতে পরিণত হবে তা নির্ধারণ করে। জড় আকার ছাড়া অস্তিত্বশীল হতে পারে না; আবার আকার জড় ছাড়াও পরিস্ফুটিত হয় না। এ্যারিস্টটলের মত আল-ফারাবীও বলেন, এ দু'টির একটিকে সরিয়ে নিলে কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না।

আল-ফারাবী সত্তার আলোচনায় দ্রব্য (substance) এবং অবান্তর লক্ষণকে (accident) টেনে আনেন। তাঁর মতে, দ্রব্য নিজেই অস্তিত্বশীল অন্য কিছুতে নয়। অবান্তর লক্ষণ হল এমন যার জন্য দ্রব্য প্রয়োজনীয়, কারণ এ দ্রব্যে এবং এর দ্বারা এ লক্ষণ অস্তিত্বশীল হয়।

আল-ফারাবী দ্বিতীয় অংশে অধিবিদ্যক ধর্মতত্ত্বের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেন। আমরা সত্তার আলোচনা থেকে জেনেছি যে, তাঁর মতে পরম সত্তা বা অনিবার্য সত্তাই আল্লাহ। তিনি স্বয়ম্ভূ, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সর্বজ্ঞাতা। তিনি সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং সৃজিত নন। তিনি তাঁর সৃজিত সব কিছু সম্পর্কে জ্ঞাত। কিন্তু সৃজিত মানুষ কি তাঁর সম্পর্কে কোন জ্ঞানলাভ করতে পারে? বা আরও সহজ করে প্রশ্ন উত্থাপন করলে প্রশ্নটি দাঁড়ায়– তিনি সব কিছু সম্পর্কে জ্ঞাত, কিন্তু তাঁকে কি জানা যায়?

আল-ফারাবী এ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে এর উত্তর দিতে ইতস্ততবোধ করেন। তিনি বলেন– আল্লাহ জ্ঞাতব্য (knowable) এবং অজ্ঞাতব্য (unknowable), প্রকাশ্য এবং গোপনীয়। তিনি ফুসুম আল-হিসাম গ্রন্থে বলেন তাঁর সম্পর্কে সর্বোত্তম জ্ঞান হল এটুকু জানা যে, তিনি এমন যাঁকে আমাদের মন বিস্তারিতভাবে জানতে পারে না। তাঁর মতে, আল্লাহ কি তা জানা অত্যন্ত কঠিন। এর কারণ হল আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির সীমাবদ্ধতা। আলোর সাহায্যে রং দৃশ্যমান হয়। তাহলে এখানে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত হল– উজ্জ্বল আলো উজ্জ্বল দৃষ্টিশক্তি উৎপাদন করবে। কিন্তু এখানে আল্লাহর ব্যাপারে বিষয়টি অন্যরূপ। উজ্জ্বলতম আলো দৃষ্টিশক্তিকে ধাঁধিয়ে দেয়। আল্লাহর ক্ষেত্রে বিষয়টি এরূপ। তিনি এমন অকল্পনীয়ভাবে উজ্জ্বল যে, তাঁর দর্শন মানব চক্ষুর সহ্যক্ষমতার ঊর্ধ্বে। তিনি অন্তহীনভাবে পূর্ণ (perfect)। তাঁর অসীম পূর্ণতা আমাদের মনকে হতভম্ব' করে তোলে। এরূপ অন্তহীন পূর্ণতমকে সীমিত শক্তিসম্পন্ন এবং অপূর্ণ মানব মন কিভাবে বুঝতে সক্ষম হবে?

আল্লাহকে জানার ব্যাপারে আল-ফারাবীর ইতস্ততবোধ সত্ত্বেও তিনি বলেন যে, সমগ্র দর্শনের প্রধান লক্ষ্য হল আল্লাহর জ্ঞানলাভ করা; আর মানুষের উচিত এমন স্তরে নিজেকে উন্নীত করা যে স্তরে পৌঁছলে মানুষ নিজেকে মহাসত্য আল্লাহর মধ্যে বিলীন করে দিতে পারে। আল-ফারাবী এখানে মরমীবাদের ইঙ্গিত করেন। আল্লাহকে জানা যাবে কিনা এ ব্যাপারে তিনি ইতস্তত বোধ করলেও আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে তিনি কোনভাবেই ইতস্ততবোধ করেননি। আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য তিনি নিম্নলিখিত যুক্তি পেশ করেন–

(ক) গতি থেকে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ ঃ আল-ফারাবী এ্যারিস্টটলকে অনুসরণ করে বলেন যে, এ পৃথিবীর বস্তুসমূহ চলমান বা বস্তুসমূহ চলে (move)। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, প্রতিটি চালিত বস্তু একজন চালকের নিকট থেকে চলার গতি গ্রহণ করে। এখন অন্য কিছুকে চালনা করার পূর্বেই স্বয়ং চালকের মধ্যে যেমন গতি আছে বলে ধরে নেওয়া যাবে, তেমনি এ চালকেরও একে চালিত করার জন্য আরেকজন চালক অবশ্যই থাকবে বলে ধরে নিতে হবে। তাহলে পরবর্তী চালকেরও আরেকজন চালক থাকবে। এভাবে চলতে থাকবে এবং এর কোন অন্ত থাকবে না। কিন্তু অন্তহীনভাবে চালকচক্রের এবং চালিত বস্তুসমূহের পেছনে ধাওয়া করা অসম্ভব। সুতরাং অবশ্যই একজন অচালিত চালক থাকবে। এই অচালিত চালকই হচ্ছেন আল্লাহ।

(খ) নিমিত্ত কারণ থেকে খোদার অস্তিত্বের প্রমাণ ঃ আল-ফারাবী বলেন, নিমিত্ত কারণ চক্রের মধ্য থেকে অন্তহীনভাবে একটি নিমিত্ত কারণের ধারণা করা অসম্ভব। যা ধারণামূলক নয় তা সম্ভব নয়। সুতরাং নিমিত্ত কারণ চক্রের বাইরে অবশ্যই একটি অসৃজিত নিমিত্ত কারণ থাকবে এবং এ কারণই হলেন আল্লাহ।

(গ) অনিশ্চিত সম্ভাবনা থেকে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ ঃ এই যুক্তিটি অনিবার্য সত্তা এবং সম্ভাব্য সত্তার পার্থক্যের ওপর নির্ভরশীল। অনিবার্য সত্তা স্বয়ং অস্তিত্বশীল বা অস্তিত্বশীল না হয়ে পারে না। অনিবার্য সত্তার অনস্তিত্ব অচিন্তনীয়। সম্ভাব্য সত্তা তাই যা অন্য সত্তা থেকে এর অস্তিত্ব গ্রহণ করে এবং এর অনস্তিত্ব সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, এই পৃথিবীর অস্তিত্ব নাও থাকতে পারত অথবা এর অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, এই পৃথিবী অস্তিত্বশীল। সুতরাং এর অস্তিত্ব অন্য কোন সত্তার কারণে সম্ভব হয়েছে, এর নিজস্ব সত্তার কারণে নয়। এই পৃথিবীর অস্তিত্বের কারণ ঐ অন্য সত্তাটি সম্ভাব্য হতে পারে বা সম্ভাব্য নাও হতে পারে। এই সত্তা যদি

সম্ভাব্য সত্তা হয় তবে এর অস্তিত্বের জন্য অন্য একটি সত্তার ধারণা করা যায়। এই অন্য সত্তাটি আবার সম্ভাব্য হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। এভাবে সম্ভাব্য সত্তাচক্র চলতে থাকলে কখনই কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়। সুতরাং কার্য-কারণ চক্রের অন্ত থাকা উচিত এবং এই অন্তে এমন একটি সত্তা থাকবে যে সত্তা স্ব-অস্তিত্বশীল। এভাবে শেষাবধি আমরা এমন এক অনিবার্য সত্তার ধারণায় পৌঁছি যার অনস্তিত্ব অচিন্তনীয় এবং যার ধারণার মধ্যেই অনিবার্যভাবে তাঁর অস্তিত্ব নিহিত আছে। এই অনিবার্য সত্তাই আল্লাহ।

আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে উপরোক্ত যুক্তিগুলো বিশ্বতাত্ত্বিক যুক্তির বিভিন্ন বক্তব্য। শেষ যুক্তিটি অবশ্য তত্ত্ববিষয়ক যুক্তিরও আওতাভুক্ত। সে যাহোক, ওপরে প্রদত্ত যুক্তিগুলোর প্রত্যেকটিতে আল-ফারাবী বাস্তব ঘটনা থেকে আরম্ভ করেন, একটি নীতি প্রয়োগ করেন এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছেন। বাস্তব ঘটনা হচ্ছে গতি, সৃজিত সত্তা এবং অনিশ্চিত সম্ভাবনা। এভাবে নীতিগুলো হল– 'যা চালিত হয় তা অন্যের দ্বারা চালিত হয়; কার্য-কারণের ইঙ্গিত দেয় এবং সম্ভাব্য সত্তা অনিবার্য সত্তার ইঙ্গিত বহন করে। এর ফলে যে সিদ্ধান্ত আসে তা হল আল্লাহ অস্তিত্বশীল'।

আল-ফারাবী এভাবে তাঁর অধিবিদ্যক ধর্মতত্ত্বে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের পর আল্লাহর গুণাবলী, একত্ব ও সরলত্ব নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। অধিবিদ্যার দ্বিতীয়াংশের আলোচনার পর আমরা এবার এর তৃতীয়াংশের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

বিশেষ বিজ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ, আল-ফারাবী তাঁর অধিবিদ্যার তৃতীয়াংশে মুখ্য নীতি বা first principles সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁর এ নীতিসমূহ সত্তার ধারণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। আল-ফারাবীর মতে, সত্তার ধারণা যদি সত্য হয়, তবে মুখ্য নীতিগুলো একইভাবে সত্য। সত্তার ধারণা যদি বাস্তবতার (reality) ওপর নির্ভরশীল হয়, তবে এই নীতিগুলোও বাস্তবতার ওপর নির্ভরশীল। এই নীতিগুলো কেবল চিরন্তন কর্মের নিয়ম নয়, বাস্তবতারও নিয়ম। তাঁর মতে, আসলে প্রত্যেকটি মুখ্য নীতি সত্তার মৌলিক ধারণার ইঙ্গিত বহন করে। এই মুখ্য নীতিগুলো হল– (১) বিরোধবাধক নীতি (principle of contradiction) (৩) কার্য-কারণ তত্ত্ব (principle of causality) এবং (৩) মধ্যপদ লোপ নীতি (principle of excluded middle)।

আল-ফারাবী এ্যারিস্টটলের একান্ত ভক্ত ছিলেন বলে এ নীতিগুলোর মধ্যেই তাঁর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এ্যারিস্টটলের নিকট যুক্তিবিদ্যা হল সত্যে উপনীত হওয়ার পদ্ধতি। কিন্তু আল-ফারাবীর নিকট যুক্তিবিদ্যা সত্যে উপনীত হওয়ার পদ্ধতি এবং স্বয়ং সত্যও বটে। আল-ফারাবী যুক্তিবিদ্যা এবং সত্তাবিষয়ক বিদ্যার মধ্যে পার্থক্যহীনতার (inseparability) চিন্তা করেন। তাঁর মতে চিন্তনের ব্যাপারে যা সত্য, বাস্তবতার ব্যাপারেও তা সত্য। সুতরাং এ কথার সূত্র ধরে বলা যায়– আল-ফারাবী এ্যারিস্টটলের বিপরীতধর্মী একজন পূর্ণ ভাববাদী ছিলেন।

**অনুশীলনী**

১। আল-ফারাবীর অধিবিদ্যার তিনটি অংশ ভালভাবে পাঠ করুন এবং এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখুন।
২। সত্তা সম্পর্কে আল-ফারাবীর ধারণার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিন এবং নিজের মত প্রকাশ করুন।
৩। অধিবিদ্যক আলোচনায় আল-ফারাবী এ্যারিস্টটলকে কিভাবে অনুসরণ করেন?

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

**সত্য/মিথ্যা**

১। আল-ফারাবীর অধিবিদ্যা তিনটি অংশে বিভক্ত। সত্য/মিথ্যা
২। আল-ফারাবী সত্তাকে তিন ভাগে ভাগ করেন। সত্য/মিথ্যা
৩। আল-ফারাবীর মতে অনিবার্য সত্তাই আল্লাহ। সত্য/মিথ্যা
৪। আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য আল-ফারাবী পাঁচটি যুক্তি দেন। সত্য/মিথ্যা
৫। আল-ফারাবী মোট পাঁচটি মুখ্য নীতির উল্লেখ করেন। সত্য/মিথ্যা

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

১। আল-ফারাবীর মতে সত্তাকে সংজ্ঞায়িত
(ক) করা যায় (খ) করা যায় না
(গ) করা অসম্ভব (ঘ) ওপরের কোনটিই নয়।

২। ফারাবীর মতে সত্তা
(ক) দু' প্রকার (খ) পাঁচ প্রকার
(গ) তিন প্রকার (ঘ) সাত প্রকার

৩। আল-ফারাবীর মতে আল্লাহকে
(ক) জানা যায় না (খ) জানা যায়
(গ) পূর্ণভাবে জানা যায় না (ঘ) ওপরের কোনটিই সত্য নয়।

৪। ফারাবীর মতে অচালিত চালক হচ্ছেন
(ক) আল্লাহ (খ) দ্রব্য
(গ) অস্তিত্ব (ঘ) ওপরের কোনটিই নয়।

৫। আল-ফারাবীর মতে অনিবার্য সত্তার অনস্তিত্ব
(ক) অচিন্তনীয় (খ) অকল্পনীয়
(গ) অবাস্তব (ঘ) ওপরের কোনটিই নয়।

**রচনামূলক প্রশ্ন**

১। আল-ফারাবীর সত্তার ধারণা ব্যাখ্যা করুন।
২। অধিবিদ্যক ধর্মতত্ত্বে আল-ফারাবীর আল্লাহ সম্পর্কীয় ধারণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
৩। আল-ফারাবীর মুখ্য নীতিগুলোর পরিচয় দিন।

**উত্তরমালা**

**সত্য/মিথ্যা**

১। সত্য ২। মিথ্যা ৩। সত্য ৪। মিথ্যা ৫। মিথ্যা

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

১। খ ২। ক ৩। গ ৪। ক ৫। ক ।

# পাঠ-৪

## *পাঠ-৪ ঃ সামাজিক ও রাষ্ট্রদর্শন সম্পর্কে আল-ফারাবীর ধারণা*

## *Social and Political Philosophy of Al-Farabi*

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি**

- আল-ফারাবীর সামাজিক দর্শন সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- তাঁর রাষ্ট্র দর্শনের বিবরণ পাবেন।
- তাঁর মতে আদর্শ রাষ্ট্র ও এ রাষ্ট্রের নেতার পরিচয় পাবেন।
- আদর্শ রাষ্ট্রের পতনের কারণ সম্পর্কে অবহিত হবেন।

**ভূমিকা**

আল-ফারাবীর মুখ্য চিন্তাধারা মূলত দু'টি প্রধান ভাগে বিভক্ত। এর একটি অধিবিদ্যা এবং অন্যটি রাষ্ট্র বা রাজনীতির দর্শন। তিনি নিওপ□াটনিক এবং স্টয়িক চিন্তাধারার প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন বলে তাঁর চিন্তাধারায় অধিবিদ্যা এবং রাষ্ট্র দর্শনকে একই বিজ্ঞানের দুটি দিক বলে বিবেচনা করা যায়। এই একই বিজ্ঞানের এই দুটি শাখার বা দিকের লক্ষ্য ছিল সত্যের ভিত্তিতে সুখ অন্বেষণ করা। প্লেটো তাঁর রিপাবলিক গ্রন্থে রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির মধ্যে এক সমান্তরাল রেখা টানেন এবং একদিকে ব্যক্তি হিসেবে ও অন্যদিকে সামাজিক জীব হিসেবে চিহ্নিত করে ঐ রেখার ব্যবহার করেন। অনুরূপভাবে আল-ফারাবী মানুষ এবং সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরও জীবন্ত সমান্তরাল রেখা অঙ্কন করেন। এখানে তিনি এর মধ্যে মানুষকে কেবল অংশ হিসেবে নয়, বরং তার প্রকৃতিকে আরও বিশাল স্কেলে বা ক্ষেত্রে পরিস্ফুট করে তোলেন। তিনি তাঁর সামাজিক ও রাষ্ট্র চিন্তাধারায় প্লেটোর দ্বারা প্রভাবিত থাকা সত্ত্বেও নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে রাষ্ট্রদর্শনের এক নূতন ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁর এ ব্যাখ্যা প্লেটোর বিশ্লেষণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এ কথার সমর্থন মেলে যখন রোজেন্থাল বলেন, "মানুষ সুখলাভ করতে পারে এই রকমের ক্ষুদ্রতম রাজনৈতিক ইউনিট হিসেবে। আল-ফারাবীর 'মাদীনা' প্লেটোর ভাবধারার অনুরূপ। কিন্তু সমগ্র সভ্য জগতকে নিয়ে বৃহৎ সংস্থা এবং মধ্যাকৃতির জাতি সম্পর্কে আল-ফারাবী যা বলেছেন তা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ইসলামিক পরিবেশ থেকেই উৎসারিত।" উপরোক্ত ভূমিকা কতটুকু সত্য, তা আমরা এখন এই পাঠে খতিয়ে দেখব। আলোচনার সুবিধার্থে এবং আল-ফারাবীর আলোচনার ধারা অনুযায়ী তাঁর সামাজিক এবং রাষ্ট্রদর্শন আলাদাভাবে আলোচনা না করে আমরা প্রায় সময় একই সঙ্গে আলোচনা করব।

**আল-ফারাবীর সামাজিক ও রাষ্ট্রদর্শন**

আল-ফারাবীর সামাজিক ও রাষ্ট্রদর্শন সংক্রান্ত আলোচনা বিশাল আকারের। তিনি সামাজিক ও রাষ্ট্রদর্শন সম্পর্কে মোট পাঁচটি গ্রন্থে তাঁর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। গ্রন্থগুলো হল– (১) সিয়াসাতুল মাদানীয়া (২) আরাউয়াল আহলিল (৩) মাদীনা আল-ফাজিলা (৪) জাওয়া মিনুস সিয়াসাত এবং (৫) ইজতিমাউ মাদানীয়াত। প্লেটোর 'লজ' গ্রন্থটির অনুবাদও তাঁর এ কাজের সহায়তায় আসে।

ইসলামের ইতিহাসের প্রথম পর্যায়ে ইসলাম দ্রুতগতিতে এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে স্বল্পকালের মধ্যে এক বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সাম্রাজ্যের বিচিত্র চরিত্রের লোকজনের সামাজিক পটভূমি পর্যবেক্ষণ এবং সামাজিক ঐক্য গড়ে তোলার একটি দৃষ্টিকোণের প্রয়োজন দেখা দেয়। মুসলিম চিন্তাবিদ এবং দার্শনিকদের মধ্যে আল-ফারাবীই সর্বপ্রথম এই প্রয়োজনীয়তার কথা সম্যক উপলব্ধি করেন। এ কারণে তিনি আল-কিন্দির মত

সর্বতোভাবে প্রজ্ঞান চর্চার চেয়ে মানব প্রকৃতি বিশ্লেষণ এবং সমাজচিন্তা ও রাষ্ট্রচিন্তার দিকে মনোনিবেশ করেন।

আল-ফারাবী প্লেটো ও নিও-প্লেটোনিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও কার্যক্ষমতাকে মানব প্রকৃতির ভিত্তি গণ্য করেন। তিনি এ্যারিস্টটলের রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূলকথা 'মানব সমাজে পরস্পর সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার' দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং তাঁর সামাজিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন মানুষের কল্পনা, বাসনা, চাহিদা এবং প্রয়োজন সংখ্যাতীত হতে পারে। কিন্তু এগুলো পূরণের ক্ষমতা সীমিত। সুতরাং মানুষের একার পক্ষে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সরবরাহ করা তার সাধ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বলে মানুষ একাকী বসবাস করতে পারে না। তার মৌলিক এবং সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্য তাকে অবশ্যই অন্যের সহযোগিতা কামনা করতে হয়। যেহেতু মানুষ একাকী তার প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম নয়, সেহেতু তার অস্তিত্ব রক্ষার ও জীবনের উন্নতির জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজনে তাদেরকে একত্রিত হতে হয়। তিনি মনে করেন– এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে মানুষ সংঘবদ্ধ ও সম্প্রদায়ভুক্ত হয় এবং সমাজ গড়ে তোলে। এভাবে বিশ্লেষণ করে তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, পরস্পর সহযোগিতা করা, সংঘবদ্ধ হওয়া এবং সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া মানুষের অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য।

আল-ফারাবীর মতে সমাজে বসবাসরত মানুষের পরস্পর সহযোগিতা একত্রিত হওয়া বা সমাজবদ্ধ হওয়ার উৎস। আবার পরস্পর সহযোগিতার ব্যাপ্তি, গভীরতা ও মূল উদ্দেশ্য, সংঘবদ্ধতার রূপ বিস্তৃতির আকার ও আদর্শগত চরিত্রের পরিমাণ নির্ধারণ করে। উচ্চতা, পরিমাপ ও রূপের ত্রিবিধ মানদন্ডের প্রয়োগ করে তিনি বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানব সমাজের মূল্যায়ন করেন। তাঁর মতে, সর্বপ্রকার সংঘবদ্ধতা একরকম নয়। তিনি এটিকে পূর্ণ এবং অপূর্ণ এই দু'ভাগে ভাগ করেন এবং বলেন যে, অপূর্ণ সংঘগুলি অপূর্ণ বলে অন্যের ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু পূর্ণ সংঘগুলো নিজেদের নিরাপত্তা বিধান ও প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম বলে অপরের ওপর তেমন নির্ভরশীল নয়।

কিন্তু এর পরেও, আল-ফারাবীর মতে, কথা থেকে যায়। সকল মানুষের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এক রকম নয় বলে পূর্ণ সংঘ থাকা সত্ত্বেও কোন কোন সময় অপূর্ণতা এসে যায়। সে কারণে আরও মজবুতভাবে মানুষের সমাজবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। এই আবশ্যকতাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ সমাজ বা গোষ্ঠী সংঘবদ্ধ হলেও মানুষের মধ্যে আরও এমন সমস্যা দেখা দেয়– সেগুলো পূরণের জন্য বৃহত্তর পরিমাপে সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আল-ফারাবী এ চিন্তা থেকেই সমাজবদ্ধ মানুষের রাষ্ট্রীয়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। কারণ রাষ্ট্রই কেবল মানুষের মধ্যে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

আল-ফারাবী বলেন, প্রত্যেক সমাজে সাধারণত বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ বসবাস করে। এদের মধ্যে সরল, বোকা, ধূর্ত, সদয়, দয়ালু, নির্দয়, কঠিন, লোভী, প্রকৃত বুদ্ধিমান বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ আছে। এদের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক এবং দ্রব্য সামগ্রীর আদান প্রদানজনিত কারণে সমাজে অসামঞ্জস্যতার সৃষ্টি হয়। ফলে সমাজে নানান সংকট ও সমস্যার উদ্ভব হয়। এ জাতীয় সমস্যা ও সংকট মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে। ফলে জীবনযাপন ব্যাহত হয় এবং ক্রমান্বয়ে বসবাস করা দু:সাধ্য হয়ে ওঠে। সমস্যা ও সংকটের দ্বারা জর্জরিত হয়ে শেষাবধি জনগণ উপলব্ধি করে যে, সকল মানুষকে তাদের নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী স্বাধীনভাবে চলতে দিলে সমাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা এবং টিকিয়ে রাখা অত্যন্ত কঠিন ও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এই উপলব্ধির ভিত্তিতে জনগণ সম্মিলিত হয়ে তাদের জীবনের জটিলতা, সমস্যা ও সংকট সম্পর্কে আলোচনা করে। ফলে পরস্পর সহযোগিতা ও সম্মতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষমতা পরিহার করার সংকল্প গ্রহণ করে। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় ক্ষমতা বা অধিকার পরিহার করে এ শর্তে যে সকলের সম্মিলিত সম্মতি ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং সকলের অনুমোদন ছাড়া কেউ কারও ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। আল-ফারাবী মনে করেন, এরূপে মানুষ স্বীয় ক্ষমতা বা অধিকার পরিত্যাগ করে একটি

সামাজিক চুক্তিতে উপনীত হয়। ফলে তারা তাদের জীবনের শান্তি ও রাষ্ট্রীয় জীবনের ভিত্তি স্থাপন করে। এ চুক্তির ব্যতিক্রম হলে নাগরিকরা সম্মিলিতভাবে এর মোকাবেলা করে। এ চুক্তির ফলেই রাষ্ট্রের উদ্ভব এবং সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

আল-ফারাবী তাঁর সময়কালের জ্ঞান বিজ্ঞানের ধারা লক্ষ্য করেন। এর সাথে সাথে সে সময়ের বাগদাদের কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক দুর্বলতার ফলে উদ্ভূত বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা এবং সমাজে অস্থিতিশীলতা লক্ষ্য করেই আইনের শাসনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন ও এ জাতীয় সামাজিক চুক্তির অবতারণা করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, আল-ফারাবী বর্ণিত অবস্থা অনুধাবন করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে হবস, লক এবং রুশো সামাজিক চুক্তিতত্ত্বের উন্মেষ ঘটান।

সে যাহোক, আল-ফারাবী রাষ্ট্রীয় জীবনের পত্তনের কথা বলে ক্ষান্ত হননি। তিনি এরপর আরও গভীরভাবে চিন্তা করে রাষ্ট্রের রূপরেখা, নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য এবং অধঃপতিত রাষ্ট্রের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁর উপরোক্ত সমাজ দর্শনের প্রেক্ষাপটে এখন তাঁর রাষ্ট্রদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাপারে আল-ফারাবী যে ধরনের চুক্তিবাদের কথা বলেন, তা সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় চুক্তিবাদের মত নয়। তিনি ইউরোপীয় চুক্তিবাদের ন্যায় প্রাকৃতিক আইনে বা কোন কাল্পনিক রাজ্যে বিশ্বাসী ছিলেন না। চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে– সেকথাও তাঁর মুখ্যকথা নয়। তিনি তাঁর বক্তব্যে পরিকল্পিতভাবে বলেন, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আগে থেকেই বিদ্যমান। কিন্তু এ রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা, নিরাপত্তাহীনতা ও অশান্তি দূর করার লক্ষ্যে ন্যায়বিচার বা ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এ প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ চুক্তিবদ্ধ হয় এবং সুখ-শান্তি ও ইনসাফ কায়েম করে। কোন রাষ্ট্রে ইনসাফ বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলেই সে রাষ্ট্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ভিন্ন হয়ে যায়, তিনি এখানে প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্পের মতই ইনসাফসম্পন্ন আদর্শ রাষ্ট্রের কথা বলেন।

আল-ফারাবী বলেন, যে সংঘ স্বয়ংসম্পূর্ণ সেগুলোকে নগর রাষ্ট্র বলা যায়। আর যেগুলো অসম্পূর্ণ সেগুলো রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের নয়। তাঁর মতে নগর রাষ্ট্র ক্ষুদ্র সংঘগুলোর তুলনায় বৃহত্তর আবার এ ধরনের বৃহত্তর নগর রাষ্ট্র স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্র সংঘগুলোর তুলনায় ক্ষুদ্রতর। এভাবে ক্ষুদ্রতর ও বৃহত্তরের সমীকরণের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সর্বশেষে বিশ্বব্যাপী একটি বিশ্বরাষ্ট্রও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কারণ পরস্পর সহযোগিতার সূত্র থেকে মানব জীবনের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের বৃহত্তর সুবিধা অর্জনের তাগিদে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। ক্রমে বৃহত্তর সুবিধা, সুযোগ এবং স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের জন্য মানব গোষ্ঠীর পরস্পর সহযোগিতা এ পর্যায়ে পৌঁছে যে, যেসব কারণে ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়, সেসব কারণে বিশ্বরাষ্ট্রেরও উৎপত্তি হতে পারে। আল-ফারাবী এ সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন বলে তিনি মনে করেন যে, এ ধরনের বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় না বিভিন্ন কারণে। এদের প্রধান দু'টি কারণ হল– ভৌগোলিক ও কৃত্রিম। কাজেই বিশ্বরাষ্ট্রের ধারণার পরিবর্তে তিনি জাতীয় রাষ্ট্র ও নগর রাষ্ট্রের প্রতি নজর দেন। তিনি বলেন যে, একটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধার পরিমাপ ও পরিমাণ সাধারণভাবে এর আয়তনের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু আয়তনে বৃহত্তর হলেও কোন রাষ্ট্র গুণগত দিক দিয়ে সর্বোত্তম নাও হতে পারে। তাঁর মতে, যে রাষ্ট্রের নাগরিকগণ পরস্পর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমে একে অপরের সুখ অর্জনে সহায়তা করে এবং এভাবে পরম সুখ অর্জন করতে পারে, সেই রাষ্ট্রই 'আদর্শ রাষ্ট্র'। ইসলাম ও পরকালের পরম সুখ অর্জনের জন্য মূল আদর্শই হবে ঐ রাষ্ট্রের ভিত্তি যা আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে। আর আদর্শভিত্তিক এ রাষ্ট্রকেই যথার্থ অর্থে আদর্শ রাষ্ট্র বলা যায়। এজন্য আল-ফারাবী তাঁর গ্রন্থে বলেন, যে রাষ্ট্রের নাগরিকগণ ঐ জিনিস অর্জন করতে একে অপরকে পরস্পর সাহায্য করে, যার মাধ্যমে পরম সুখ লাভ করা যায়, তাই আদর্শ রাষ্ট্র।

প্লেটো তাঁর রিপাবলিক গ্রন্থে আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করতে গিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে যে বিষয়টি বিবেচনা করেন– তাহল নেতৃত্বের কথা। রাষ্ট্রের নেতৃত্ব যদি সঠিক ও আদর্শসম্মত না হয় তবে সে

রাষ্ট্রও আদর্শ হতে পারে না। প্লেটোর এ চিন্তাধারার সূত্র ধরে আল-ফারাবীও আদর্শ রাষ্ট্রের নেতা ও নেতৃত্বের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তাঁর গ্রন্থে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সমাজ এবং রাষ্ট্রে ঐক্য ও শান্তি বজায় রাখতে হলে যথার্থ নেতৃত্বের প্রয়োজন। তাঁর মতে, যারা যুক্তিপূর্ণ ও প্রজ্ঞাময় চিন্তার মাধ্যমে যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম, তাঁরাই নেতৃত্বের উপযুক্ত।

আল-ফারাবী বলেন, সব মানুষই একই রকম যোগ্যতার অধিকারী হতে পারে না। কিছু লোক যুক্তি ও জ্ঞান প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অধিকতর দক্ষ। যারা তথ্যের ভিত্তিতে যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে, নিজেদের ভাব ব্যক্ত করতে এবং অন্যদেরকে নিজেদের মনোভাব বুঝাতে দক্ষ, তারাই নেতৃত্বের উপযুক্ত। অন্যদিকে যারা নিজেরা বুঝতে পারে কিন্তু অন্যদের বুঝাতে অক্ষম, তারা নেতৃত্বের গুণ বিবর্জিত। সুতরাং যারা নেতৃত্বের গুণে গুণান্বিত ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ, তারা অন্যদেরকে নেতৃত্ব দিবে। আল-ফারাবী মানুষের মধ্যে নিহিত বিভিন্ন রকম গুণের কথা চিন্তা করে বলেন যে, একই নেতার পক্ষে সকলকে সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদান অসম্ভব। সেহেতু অধিকতর দক্ষতাসম্পন্ন লোক, অপেক্ষাকৃত কম দক্ষতা সম্পন্ন লোককে নেতৃত্ব দিতে পারে। আবার অন্যভাবে তিনি বলেন– একজন নেতার পক্ষে শুধু ঐসব ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদান করা বাঞ্ছনীয়, যেক্ষেত্রে তিনি অন্যদের চেয়ে শ্রেয়তর। এভাবে প্রয়োজন অনুসারে একই ক্ষেত্রে একজন প্রধান নেতা একজন দ্বিতীয় নেতা এবং দক্ষতা অনুযায়ী আরও নেতা থাকতে পারে। এ অবস্থায় প্রধান নেতা দ্বিতীয় নেতাকে এবং দ্বিতীয় নেতা, তৃতীয় নেতাকে এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য নেতাদেরকে নেতৃত্ব দিতে পারে। উন্নত স্বভাব-চরিত্র, শিক্ষা-দীক্ষা ও অন্যান্য গুণাবলীর জন্য যিনি সব সমস্যা পর্যবেক্ষণ এবং হৃদয়ঙ্গম করেন এবং অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেই সমস্যার সমাধান দিতে পারেন তিনিই প্রধান নেতা। আল-ফারাবী এ ধরনের নেতাকে রইস-আল-আওয়াল বলেছেন।

আল-ফারাবীর মতে এ ধরনের রইস আল-আওয়াল কেবল একজনই হবেন, যার ওপর আর কোন নেতা থাকবে না। এ প্রধান নেতা নিজে শ্রেষ্ঠতম নেতৃত্বের দ্বারা রাষ্ট্রের সমস্ত কার্য ও কল্যাণ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। আদর্শ রাষ্ট্রে বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যক্রমের জন্য যে বিভিন্ন কর্মচারী শ্রেণী থাকবে, তাদের পরিচালনার দায়িত্বও এ প্রধান নেতার। ফলে তিনি হবেন কর্মচারী বাহিনীর 'সর্বাধিনায়ক'। এ নেতা আদেশ প্রদান করবেন কিন্তু আদেশ গ্রহণ করবেন না। এরূপ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক প্রধান নেতা সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে অনুভব করেন এবং মহাপ্রভুর গুণাবলীর অনুসরণ করে রাষ্ট্রে বসবাসকারী নাগরিকদের প্রত্যেককে উপযুক্ততা ও মর্যাদা অনুযায়ী যথাস্থানে নিয়োগ দেবেন এবং এ ব্যাপারে ন্যায়নীতি বজায় রাখবেন।

প্লেটোর মত আল-ফারাবীও আদর্শ রাষ্ট্রের আদর্শ শাসকের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার কথা বলেন; যদিও প্লেটোর শিক্ষা কর্মসূচি তিনি গ্রহণ করেননি। তবে এ শিক্ষার পেছনে তাঁর লক্ষ্য ছিল প্রকৃত খাঁটি এবং উপযুক্ত ইমাম বা নেতা তৈরি করা। তিনি মনে করেন যে, শিক্ষা শেষ করে এবং যুক্তিবিজ্ঞানের পারদর্শী হয়ে ওঠার পর এসব শিক্ষিত ব্যক্তিদেরকে নগর রাষ্ট্রের নেতা হিসেবে নিযুক্ত করা হবে। এরপর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ক্রমে ক্রমে তাঁরা অগ্রসর হবেন এবং শেষপর্যন্ত বৃহত্তর রাষ্ট্রের স্তরে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের পদোন্নতি দেওয়া হবে। আল-ফারাবীর নেতা তৈরি করার পদ্ধতি অনেকটা প্লেটোর মতই, তবে পারলৌকিক জ্ঞান ও সুখ অর্জনের জ্ঞানের প্রসঙ্গ আল-ফারাবীর নিজস্ব।

আল-ফারাবী আদর্শ রাষ্ট্রের প্রধান নেতা এবং পরবর্তী স্তরের নেতাদের জন্য তাঁর ফুসুস আল-মাদানী এবং মাদিনাতুল ফাজিলা গ্রন্থে অনেকগুলো গুণের কথা বলেন। কোন ব্যক্তির মধ্যে এ গুণগুলোর সমাবেশ ঘটলেই তাঁর নেতৃত্বের উপযুক্ততা অর্জিত হবে। আদর্শ রাষ্ট্রের "প্রথম শাসকের" জন্য যেসব গুণ প্রয়োজনীয়, আল-ফারাবী সেসব গুণের মধ্যে তাঁর ফুসুস আল-মাদানী গ্রন্থে মোট ছয়টি গুণের কথা উল্লেখ করেন। গুণগুলো এরূপ–

১। শাসনকার্যে দক্ষ হওয়া।
২। সৎ চরিত্র, দার্শনিক ও রসুল বা প্রত্যাদিষ্ট হওয়া।

৩। সত্য প্রকাশের জন্য ভাষাগত ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন হওয়া।
৪। নাগরিকগণকে ইহ ও পরকালের পরম সুখের দিকে পরিচালিত করার যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া।
৫। যে কোন রাষ্ট্রীয় কর্ম সম্পাদন করার সামর্থসম্পন্ন হওয়া।
৬। জিহাদ পরিচালনা করার ব্যাপারে ব্যক্তিগত যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া।

এছাড়া তিনি তাঁর গ্রন্থ মাদিনাতুল ফাজিলায় প্রধান শাসকের জন্য আরও বারটি গুণের উল্লেখ করেন। আদর্শ রাষ্ট্রের ইমাম বা প্রধান শাসকের নিম্নলিখিত গুণ থাকলে তিনি বিশ্বরাষ্ট্রের নেতৃত্ব দান করারও ক্ষমতা সম্পন্ন হতে পারেন। গুণগুলো হল–

১। সু-স্বাস্থ্য ও শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দিক দিয়ে নিখুঁত হওয়া।
২। মেধা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব হওয়া যাতে যে কোন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে কারও কথা শুনে অতি সহজে বুঝতে পারেন।
৩। প্রখর স্মৃতিসম্পন্ন হওয়া যাতে তিনি যা শুনেন, দেখেন এবং প্রত্যক্ষণ করেন তা মনে রাখতে পারেন।
৪। দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমান হওয়া যাতে তাঁর সম্মুখে উপস্থাপিত যে কোন সমস্যার প্রেক্ষিত বুঝে কাজ করতে পারেন।
৫। বাগ্মিতা যাতে তাঁর মনের কথা তিনি যেভাবে মনে করেন সেভাবে প্রকাশ করতে পারেন।
৬। শিক্ষা এবং জ্ঞানার্জনে প্রবল আগ্রহ এবং জানার্জনে কোন বিরক্তি প্রকাশ না করার ব্যাপারে সংযমী হওয়া।
৭। খাদ্য, পানীয় ও সংগমের প্রতি নির্লোভ হওয়া, খেলাধুলা পরিহার করা এবং এগুলোর প্রতি বিতৃষ্ণ হওয়া।
৮। সত্য এবং সত্যবাদীর প্রতি বন্ধুত্বসম্পন্ন হওয়া এবং মিথ্যার প্রতি ঘৃণাবোধ থাকা।
৯। হৃদয়ের প্রশস্ততা, মহত্ব থাকা এবং নীচতা বোধ থেকে দূরে থাকা।
১০। যে কোন প্রকার ধনসম্পদের প্রতি নির্লোভ ও অমনোযোগী হওয়া।
১১। প্রকৃতিগতভাবে ন্যায়বিচার ও ন্যায়বানের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকা এবং অন্যায় ও অবিচারের প্রতি ঘৃণাবোধ থাকা।
১২। দৃঢ়চেতা, সাহসী এবং দ্রুতগতিসম্পন্ন হওয়া এবং এ ব্যাপারে কোন প্রকার দুর্বলতার চিহ্ন প্রদর্শন না করা।

এখানে লক্ষণীয় যে, কোন ব্যক্তির পক্ষে উপরোক্ত গুণসম্পন্ন হওয়া অত্যন্ত কঠিন ও অবাস্তব। আদর্শ রাষ্ট্রে কোন ব্যক্তির মধ্যে এরূপ গুণের অভাব দেখা গেলে পূর্ববর্তী প্রধান শাসকের আইন অথবা তাঁর উত্তরসূরি শাসন কার্য পরিচালনা করবেন। তবে এরূপ গুণে যিনি গুণান্বিত হবেন তিনি হবেন "প্রধান শাসক", যার উদাহরণ হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর দ্বারা শাসিত মদিনার রাষ্ট্র।

'প্রধান শাসকের' পর যিনি দ্বিতীয় পর্যায়ের শাসক হবেন, আল-ফারাবীর মতে তাঁকে নিম্নলিখিত গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে–

১। তাঁকে প্রজ্ঞাসম্পন্ন এবং দার্শনিক হতে হবে।
২। জ্ঞানী এবং প্রথম আদর্শ শাসকের প্রদত্ত আইন, রীতি-নীতি ও অনুশাসনগুলো যথার্থ জ্ঞান ও এগুলো তাঁর নিজের জীবনে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় কথায় ও কাজে প্রয়োগ করার ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়া।
৩। কোন আইন তাঁর সামনে না থাকলে নতুন নীতি নিয়ম খুঁজে বের করার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত দক্ষ হবেন।
৪। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী তিনি পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে নতুন নিয়ম-কানুন প্রণয়নে সক্ষম।
৫। প্রভূত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং বাগ্মিতা যাতে তাঁকে শরীয়াহ্ অনুসারে জনগণ অনুসরণ করে সে ব্যাপারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে, পরিচালনার পথ প্রদর্শনে সহায়তা করে।

৬। শারীরিকভাবে সক্ষম ও যুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী হওয়া।

অন্যকথায়, এ শাসকের থাকবে গভীর অন্তর্দৃষ্টি যার দ্বারা তিনি তাঁর পূর্বসূরির নিকট প্রাপ্ত রীতি-নীতি থেকে অনুমানের ভিত্তিতে ঘটনাবলীর ত্বরিৎ সমাধান দিতে পারেন এবং রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি সাধন করতে পারেন। অন্যকে বিশ্বাসী করে তোলার ক্ষমতা তাঁর থাকবে এবং তিনি হবেন অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমী। এই সার্বভৌম শাসককে ঐতিহ্যের রাজা বলা হবে এবং রাষ্ট্রকে আল-মূলক আল-সুন্নাহ বলা হবে।

ওপরে বর্ণিত গুণাবলী যদি এক ব্যক্তির মধ্যে উপস্থিত না থাকে এবং যদি এমন দু'জন ব্যক্তি যাদের একজন জ্ঞানী এবং অন্যজন অন্যান্য গুণাবলীর অধিকারী হন তবে এই দুই ব্যক্তিই একত্রে রাষ্ট্রের শাসক হবেন। এরা তৃতীয় পর্যায়ের শাসক বলে বিবেচিত হবেন।

আদর্শ শাসক হওয়ার মত উপযুক্ত একজন নেতা পাওয়া না গেলে যদি দুই-এর অধিক ব্যক্তির মধ্যে বা এমন ধরনের একদল লোকের মধ্যে ঐসব গুণাবলী বর্তমান থাকে যারা একত্রে কাজ করতে সম্মত, তবে আদর্শ শাসকের দায়িত্ব তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে। তাঁরা একযোগে প্রথম আদর্শ শাসকের আদর্শ অনুযায়ী সমবেতভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। এ পর্যায়ের শাসকগণকে আল-ফারাবী চতুর্থ পর্যায়ের শাসক বলে অভিহিত করেন।

আল-ফারাবী বলেন, জ্ঞান যদি রাষ্ট্রের অংশ গঠন না করে এবং অন্যান্য অবস্থা পূর্ণ থাকে, তবে রাষ্ট্র সার্বভৌম ছাড়া উত্তম রাষ্ট্র হবে, তবে এ রাষ্ট্র ধ্বংসের সম্মুখীন হতে পারে। দার্শনিক ছাড়া যে কোন রাষ্ট্র অতি শীঘ্রই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

আল-ফারাবী প্লেটোর ন্যায় অধ:পতিত রাষ্ট্রের বিষয়েও সম্যক জ্ঞাত ছিলেন। তিনি তাঁর সমকালীন ধারণা ও উদাহরণগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নয় প্রকার অধ:পতিত রাষ্ট্রের উল্লেখ করেন। এগুলো হল–

১। প্রয়োজনভিত্তিক (জরুরিয়া) রাষ্ট্র যেখানে সংবেদনশীল কর্মকাণ্ডই মুখ্য;
২। ধনতন্ত্রবাদী (নসালা) রাষ্ট্র যেখানে ধন অর্জনই মুখ্য উদ্দেশ্য;
৩। ইন্দ্রিয়সেবী (খদিষা) রাষ্ট্র যেখানে জনগণ ইন্দ্রিয়পরায়ণ হয়ে ওঠে;
৪। গৌরববাদী (করাবা) রাষ্ট্রে গৌরব অর্জন করাই মুখ্য উদ্দেশ্য;
৫। বশীভূত করার আকাঙ্ক্ষা (তগলুব) রাষ্ট্র যেখান পরস্পরকে বশীভূত করা মুখ্য উদ্দেশ্য;
৬। গণতন্ত্রকামী (জেবাইয়া) রাষ্ট্র যেখানে সবাই নিজেদেরকে স্বাধীন ও সমান মনে করে;
৭। ভ্রষ্ট (ফাসেক) রাষ্ট্র যেখানে জনগণ অন্যায় ও মিথ্যার অনুসারী হয়;
৮। পরিবর্তনবাদী (মুতবাদিলা) রাষ্ট্র যা 'ভাল' মতের পরিবর্তে 'মন্দ' জনমত দ্বারা বিতাড়িত।
৯। আদর্শচ্যুত (দল্লা) রাষ্ট্র, যেখানে জনগণ ভ্রান্তধারায় বিশ্বাসী।

আল-ফারাবীর মতে ওপরের রাষ্ট্রগুলো স্বাধীন ও আদর্শ রাষ্ট্ররূপে টিকে থাকে না।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, আল-ফারাবী নি:সন্দেহে একজন বড় মাপের সমাজ ও রাষ্ট্র দার্শনিক ছিলেন।

**অনুশীলনী**

১। আল-ফারাবীর সমাজ দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

২। আল-ফারাবীর সামাজিক চুক্তি মতবাদ ব্যাখ্যা করুন। তাঁর রাষ্ট্র দর্শনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন এবং এ ব্যাপারে আপনার চিন্তাপ্রসূত মতামত দিন।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

**সত্য/মিথ্যা**

১। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে ফারাবীর মতবাদ এ্যারিস্টটলের মতই। সত্য/মিথ্যা

২। হবস, লক, রুশো ও আল-ফারাবীর সামাজিক চুক্তি মতবাদ একই রকম। সত্য/মিথ্যা

৩। আল-ফারাবী বিশ্ব রাষ্ট্রের ধারণা পোষণ করতেন। সত্য/মিথ্যা

৪। আল-ফারাবী বলেন রইস আল-আওয়াল একজনই হবেন। সত্য/মিথ্যা

৫। ফারাবীর মতে প্রধান শাসকের বত্রিশটি গুণ থাকতে হবে। সত্য/মিথ্যা

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

১। আল-ফারাবীর চিন্তাধারাকে বিভক্ত করা যায়

(ক) তিনভাগে (খ) দু'ভাগে

(গ) নয় ভাগে (ঘ) কোনভাগেই নয়।

২। আল-ফারাবীর সামাজিক চুক্তি মতবাদের ভিত্তি হল

(ক) পরস্পর সহযোগিতা (খ) দ্বন্দ্ব কলহ

(গ) সামাজিক আচরণ (ঘ) স্বার্থ সংরক্ষণ

৩। আদর্শ রাষ্ট্রের প্রধান শাসকের গুণ থাকবে মোট

(ক) পাঁচটি (খ) বারটি

(গ) বিশটি (ঘ) ওপরের কোনটিই নয়।

৪। আল ফারাবী মতে দ্বিতীয় প্রধান শাসকের গুণ থাকবে

(ক) ছয়টি (খ) আঠারটি

(গ) একটি (ঘ) ওপরের কোনটিই নয়।

৫। আল-ফারাবীর অধ:পতিত রাষ্ট্রের সংখ্যা হল

(ক) দশটি (খ) তিনটি

(গ) নয়টি (ঘ) পঁচিশটি (ঙ) ওপরের কোনটিই নয়।

**রচনামূলক প্রশ্ন**

১। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে আল-ফারাবীর মতবাদ ব্যাখ্যা করুন।

২। আল-ফারাবী কিভাবে আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণায় উপনীত হন তা ব্যাখ্যা করুন।

৩। আদর্শ রাষ্ট্রের প্রধান শাসকের গুণাবলী উল্লেখ করুন।

৪। আল-ফারাবীর আদর্শ রাষ্ট্রের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার শাসকের গুণাবলী ব্যাখ্যা করুন।

৫। আল-ফারাবীর মতে অধ:পতিত রাষ্ট্রের কারণগুলো উল্লেখ করুন।

**সমস্যা**

ক. আল-ফারাবী বিশ্বরাষ্ট্র স্থাপনের কথা বলেন। কিন্তু তিনি নিজেই বলেন– এ ধরনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এখানে এ ধরনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সমস্যা কোথায়?

খ. তিনি প্লেটো ও এ্যারিস্টটলের রাষ্ট্রদর্শনের অনুসরণ করে তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণা দেন। কিন্তু তাঁর ধারণা ও প্লেটো এবং এ্যারিস্টটলের ধারণার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য স্পষ্ট। কোন সমস্যার কারণে তিনি এ পার্থক্য আনয়ন করতে বাধ্য হন? লিখুন।

**উত্তরমালা**

**সত্য/মিথ্যা**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১। মিথ্যা | ২। মিথ্যা | ৩। সত্য | ৪। সত্য, | ৫। মিথ্যা |

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১। খ | ২। ক | ৩। খ | ৪। ক | ৫। গ |